Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারন ও তার প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিনা ইয়াসমীন

রোলঃ 228021605

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারন ও তার প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিনা ইয়াসমীন

রোলঃ 228021605

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারন ও তার প্রতিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবিনা ইয়াসমীন, আইডিঃ 228021605 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারন ও তার প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সাবিনা ইয়াসমীন

আইডিঃ 228021605

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা..৭

ইসলামে মুসলিম সমাজের গুরুত্ব:.. ৮

বিপথগামী মুসলিমদের প্রকৃতি: ৯

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন ১১

মুসলিম বিশ্বে ফিতনার সূচনা ঃ ১১

মুনাফিকদের ধারাবাহিক চক্রান্ত ঃ ১৫

জাহেলিয়াতের যুগ : ১৭

মানবতার মুমূর্ষুদশা ১৭

এক নজরে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম ১৯

রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ ২০

রোমান শাসনে মিশর: ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা...................................২১

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জাতিগোষ্ঠী : ২২

দ্বিতীয় শতকে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থাঃ ২৪

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন ২৯

পারস্যের সম্রাটপূজা : ৩০

ভারতবর্ষ: ধর্ম,সমাজ ও নৈতিকতার বিচারে : ৩১

হিন্দু সমাজে নারীর মর্যাদা :...৩২

ক্রুসেডের বিভীষিকা ৩৩

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ৩৮

অনুকরণের বেড়াজাল ৪২

পতন পরিক্রমা ঃ..৪৫

দৃশ্যপটের পরিবর্তন ৫৪

হাওয়া বদল.. ৫৫

উত্তরনের পূর্বকথা ৫৯

কাজেই ভাবতেই হবে ৬১
চিন্তার পুনর্গঠন'চিন্তা' (Thought); ৬৩
প্রজ্ঞা ৬৫
যুগের ভাষা বুঝুন ৬৬
আত্মপরিচয়...৬৭
অতএব ধর্মাশ্রয়ী হোন..৬৮
ইতিহাসচর্চা ৭০
মুসলিম উম্মাহের অধঃপতন: কারণ ও প্রতিকার...৭৪
৩. সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ না বুঝা..৭৬
৫. হকপন্থী আলেমদের অবজ্ঞা করা ৭৮
অবসর ও সময়ের সদ্ব্যবহার না করা : ৭৯
অসৎ সঙ্গ : ৮০
গণমাধ্যম ও ইন্টারনেট আসক্তি...৮১
ফেৎনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়া ৮৩
পাপ, উদ্বিগ্নতা ও কুচিন্তা :.. ৮৪
উপসংহার... ৮৫

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি রাজাধিপতি, মহাপবিত্র, শান্তিদাতা, মহামহিম, মহাসম্মানিত। আমাদের জন্য তিনি ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন, আমাদের উপকারার্থে দ্বীনের বিধি-বিধান পরিপূর্ণ করেছেন এবং আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি তাকে ভালবাসেন, যে বলে, 'আমি আল্লাহ প্রতি ঈমান এনেছি'। তারপর সে এ কথার উপর অটল থাকে। শান্তিময় আবাস হিসাবে তিনি তাকে জান্নাত দিবেন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে নবী আগমনের ধারার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। ফলতঃ তিনি হয়েছেন নবুঅতের মোহরাঙ্কিত সুধা। আল্লাহ তাঁকে মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তাই তিনি মানব জাতিকে আল্লাহ্ হুকুম মানতে আদেশ করেছেন এবং বিচ্যুতি ও পাপাচার থেকে সতর্ক করেছেন। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর পূত-পবিত্র রহমত এবং পরিপূর্ণ শান্তি বর্ষণ করুন এবং সন্তুষ্ট থাকুন তাঁর জ্ঞানী-গুণী পবিত্র পরিবারের এবং তাঁর সম্মানিত ছাহাবীগণের প্রতি।

'কয়েক যুগ ধরে মুসলমানদের ব্যাপারে এই প্রশ্নটি সামনে আসছে, দিনদিন মুসলমান জাতির সিফাতে মাহমুদা তথা প্রশংসনীয় গুণাবলিগুলোর অবক্ষয় ঘটছে এবং সিফাতে মাজমুমা তথা নিন্দনীয় গুণাবলি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অন্য কথায়, সমস্ত ভালো কাজ যেমনঃ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব, অর্থসম্পদ, মান-সম্মান, নীতি-নৈতিকতা, আদব-আখলাক ইত্যাদি ছেড়ে দিচ্ছে মুসলমানরা। আর সমস্ত খারাপ কাজ যেমনঃ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, খারাপ অভ্যাসসহ নতুন নতুন অপকর্মের জন্ম দিচ্ছে এবং এর বিকাশ ঘটাচ্ছে। এগুলো এমন গর্হিত কাজ, যা একটি জাতিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

ছালাত ও সালামের পর আমি আপনাদের সামনে মুসলিম উম্মাহ অধঃপতনের কারণ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু কথা তুলে ধরছি।

ইসলামে মুসলিম সমাজের গুরুত্ব:

মুসলিমসমাজই সমাজের মূল শক্তি। তারাই সমাজের খুঁটি বা ভিত্তি। যেকোন সমাজ ও জাতির সুস্থতা নির্ভর করে তার মুসলিমসমাজের সুস্থতার উপর। অপর দিকে মুসলিমসমাজ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে সে সমাজ ও জাতির ভাগ্যাকাশে ঘোর অমানিশা নেমে আসে।

এজন্যই দেহের ক্ষেত্রে হৃৎপিন্ডের যে ভূমিকা জাতির ক্ষেত্রে মুসলিমসমাজেরও সেই ভূমিকা। হৃৎপিন্ড সুস্থ থাকলে যেমন সারা দেহ সুস্থ থাকে; আর তা খারাপ হয়ে পড়লে সারা দেহ সমস্যাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তদ্রূপ মুসলিমসমাজ ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর সহজেই চলবে। কিন্তু তারা ছিরাতুল মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হলে, তাদের মধ্যে দ্বীনদারীর অভাব ঘটলে পুরো সমাজে দ্বীনহীনতার কুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। মুসলিমকদের মধ্যে বেশীরভাগ সময় শিশুসুলভ আচরণ লক্ষ করা যায়। তারা আল্লাহর ইবাদতে যত্নবান হতে চায় না। কিন্তু এই সময়ের ইবাদতের মূল্য অত্যধিক।

তাই তো হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَا لَى فِى ظِلهِ يَوْمَ لَا ظِل الا ظِلهُ امَامٌ عَدْلٌ- وَشَا فِى عِبَادَةِالله- وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَقٌ فِى المساجد- وَرَجُلَانِ تَحَابا فِى الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ- وَرَجُلٌ دَعَتَهُ امْرَاةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنى اَخَافُ الله- وَرَجُلٌ تَصَدقَ بِصَدقَةٍ فَاخَفَا هَا حَتى لَا تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ- وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَينَاهُ

‘যেদিন আল্লাহর বিশেষ ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা‘আলা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাঁর ছায়া তলে আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. এমন মুসলিমক যে আল্লাহর ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করেছে ৩.এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে ৪. এমন দু’জন ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবেসে একত্রিত হয় এবং পৃথক হয় ৫. এমন ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী ও অভিজাত নারী (ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য) আহ্বান করে, তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি ৬. এমন ব্যক্তি যে গুপনে ছাদাক্বা করে কিন্তু তার বাম হাত জানতে পারে না যে তার ডান হাত কি ব্যয় করে ৭. এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্বরণ করে অশ্রুধারা প্রবাহিত করে।’

উক্ববা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সা.বলেছেন,

اِن الله عَزوَجَل لَيَعْجَبُ مِنَ الشاب لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিস্ময়বোধ করেন সেই মুসলিমদেরপ্রতি, যার মধ্যে ছেলেমি বা শিশুসুলভ আচরণ নেই।

বিপথগামী মুসলিমদের প্রকৃতিঃ

ইসলামের ইতিহাসে এবং আমাদের সমসাময়িক কালে অনেক মুসলিমদের আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাটানোর বহু চিত্তকর্ষক উদাহরণ রয়েছে। তারপরও বহু মুসলিম আজ অধঃপাতে নিপতিত। তবে তাদের অধঃপতনের মাত্রা ও ধরনের মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। তাদের কেউ কেউ অধঃপাতে যাওয়ার পরক্ষনে তার বিপদ আঁচ করতে পারে, কি করুণ পরিণতি দাঁড়াবে তা বুঝতে পারে এবং তার প্রভু ও তার শাস্তিকে ভয় করে। ফলে তারা যা করে ফেলেছে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং সেই পাপ-পঙ্কিলতা ও বিচ্যুতি থেকে দ্রুতই সরে আসে। পরবর্তীতে তারা এধরনেরে কাজে আর জড়িত হবেনা বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। দেখা যায়, তারা মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতিয় কাজ এবং তার প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকে।

اَلندَمُ تَوْبَةٌ اَلتا ئِبُ مِنَ الذنْبِ- كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ

'অনুতাপের নামই তওবা। আর পাপ থেকে তওবা কারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতই'।

তাদের কেউ কেউ এরূপ অধঃপতনে যাওয়ার যে কি বিপদ ও যন্ত্রনা তা বুঝতে পারে। এসব কাজের ক্ষতি, কাজকর্ম এলোমেলো হয়ে যাওয়া এবং মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ার কথা তাদের মনে জাগরুক থাকে। এজন্য তারা উসলামের পথে অবিচল থাকার ইচ্ছা মনে মনে কামনা করে, মনের প্রশান্তি ও নিরাপত্তার কথাও ভাবে; কিন্তু কুপ্রবৃত্তি এবং জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান তাদের মনকে পরাস্ত করে ফেলে। ফলে তারা তাদের রবের দিকে ফেরার চিন্তা থেকে সরে আসে এবং নিজেদের বিচ্যুতির উপর অনুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

এ ধরনের অধঃপতিতদের বেলায় সুপথে ফেরার আশা করা যায়, আবার অধপতনের অতলে তলিয়ে যাওয়ার ভয়ও থেকে যায়। এ বিষয়ে একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা.বলেছেন,

اِن الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَا ا فِي قَلبِهِ- فَئِاتَابَ وَنَزَّعَ وَاسْتَغْفَرَ- صُقِلَ قَلْبُهُ- فَانْ زَادَتْ- فَذَلِكَ الرانُ الذِي ذَكَّرَهُ الله فِي كِتَا بِهِ- (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)

যখন কোন মুমিন পাপ কাজ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তওবা করে পাপ পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে তার অন্তর ঝকঝকে নির্মল হয়ে যায়।আর যদি সে পাপের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় তাহলে কালো দাগও বাড়তে থাকে। এটাই সেই মরিচর যার কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন, كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

'কখনোই না। বরং তাদের অপকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে।' সুরা মুত্বাফফেকী ৮৩/১৪

তাদের কেউ কেউ নিজের অবস্থার কোন খবরই রাখে না। প্রতিদিন অধিকাংশ সময় তারা অবৈধ,বেআইনী ও কর্দয কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। ভয় হয় ওই অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু এসে পড়ে কি-না। অপরদিকে আল্লাহ বলেন, وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلآنَ وَلاَ ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً

আর ঐসব লোকদের তওবা কবুল হবে না,যারা মন্দকর্ম করতেই থাকে,যতক্ষন না তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা কবুল হবে না ঐসব লোকের,যারা মৃত্যু বরণ করে কাফের অবস্থায়। আমরা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' সুরা নিসা ৪/১৮

কিছু অধঃপতি এমন আছে, যারা সন্দেহপ্রবণ ও খুতঁখুতেঁ স্বভাবের। তারা নিজেদেরকে জান্নাতের প্রথম কাতারের লোক মনে করে। তাদের চারপাশে সমাজের যেসব লোক রয়েছে তাদেরকে তারা নিচু নজরে দেখে। এ বৃত্তও ছোট হতে হতে একসময় তারা নিজেদের ভাইদেরও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। এমনকি উম্মতের আলেম সমাজ ও তাদের মাতা-পিতাকেও তারা নিজেদের থেকে ানেক নিচে ভাবতে থাকে। তারা মনে করে, ইসলাম শুধুই তাদের মতো কতিপয় মুসলিমদেরমধ্যে আছে। প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা! এই শ্রেণীর অধঃপতিতরা সবচেয়ে দেশী বিপজ্জনক। কেননা এরূপ অধঃপতনের শিকার মুসলিমকগুলো জানতেই পারে না যে তারা গুঁমরাহ ও পথহারা। বরং তারা ভাবে যে, তারা নেক কাজের সাগর থেকে সদাই অঞ্জলি ভরে পান করছে। সুতরাং তওবার কথা তাদের মনে কখনই জাগে না। তাদের দ'কান ও অন্তর তালাবদ্ধ। ফলে তারা কোন সত্য ও অপ্রিয় কথা শুনতে চায় না। কখনো কখনো তারা আল্লাহ্‌র ঘরের উপরও বাড়াবাড়ি করে বসে। মসজিদসমূহে লেকচারদানের

যেসব প্রচারপত্র লাগানো থাকে তাদের মনে না ধরলে তারা সেগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলে। অথচ এ কাজ তাদের অধিকারভুক্ত নয়। তারা হক কথা শোনে না, হকের ডাকে সাড়া দেয় না এবং হকের কাছে আসে না।
নবী করীম সা. বরেছেন,

اِن الله حَجَبَ التوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كَل بِدَعَةٍ حَتى يَدْعَتَهُ

'নিশ্চয়ই আল্লাাহ প্রত্যেক বিদ'আতীর জন্যে তওবার রাস্তা পর্দাবৃত করে রাখেন, যে পর্যন্ত না সে বিদ'আত পরিত্যাগ করে'।

অবস্থা যখন এমন বিপজ্জনক তখন ওদের প্রতি অনুকম্পা এবং নিজেদেরও আমাদের ভাইদের অবস্থা যাচাইয়ের মানসে আমি আমার ভাইদের সামনে আলোচ্য বিষয়ে সংক্ষেপে মুসলিমসমাজের অধঃপতনের কিছু কারণ ও তার প্রতিকার তুলে ধরা ভালো মনে করেছি। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা সবাই মিলে যাতে আল্লাহর পথে অবিচল থাকতে পারি এবং অধঃপতন ও অনুশোচনার পথ হ'তে দূরে থাকতে পারি সে আকাঙ্ক্ষা থেকে কথা গুলো আপনাদের সামনে নিবেদন করছি।

ইবনে মাজহা হাদিস-৪২/৫২, ছহীহুল জামে হা / ৩০০৮,৬৮০৩, ইবনু মাজাহ হা ৪২৪৪, আহম্মদ হা ৭৯৩৯, মিশকাত ২৩৪২।

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন

মুসলিম বিশ্বে ফিতনার সূচনা ঃ

মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল ও বিভক্ত করেছে নানান ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ। এই ফিতনাগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়; এক. ভেতরগত, দুই. বাইরের ফিতনা। তবে বাস্তবতা হলো, এই প্রকারভেদ শুধু নামেই সীমাবদ্ধ। কারণ, এই ফিতনাগুলো ছিল মুনাফিক ও কাফিরদের তৈরি করা। ফলে এসব ফিতনার শেকড়ও ছিল অনেক গভীরে প্রোথিত। তাদের তৈরি করা ফিতনা এতটা ঠুনকো ছিল না যে, মুখের ফুঁ দিয়েই তা পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব ছিল। এই সমস্ত ফিতনা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে মুসলিম সমাজ ফিতনার বেড়াজালে ফেঁসে গিয়েছিল খুব শক্তভাবে।আবার যুগে যুগে মুসলিমরা যে যে ভুল কাজ করেছিল বা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার পেছনেও ছিল মুনাফিক ও কাফিরদের কলকাঠি। অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি, মুসলমানরা কোনো ভুল করলে এর পেছনের দৃশ্যপটে কাফির- মুনাফিকদের হাত ছিল।মানুষ ও শয়তানের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা ছিল আলো ও অন্ধকারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ আজও চলমান। নবিগণ এবং তাঁদের আদর্শের পথে চলা আদমসন্তান ও আলোর পতাকাবাহীরা এখনও সেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে নবিবিরোধীদের শয়তানের সন্তান এবং অন্ধকারের বাসিন্দা বলে আমাদের মনে করতে হবে। আর এই দুই দলের সংঘাত বহাল থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।অনেকেই বিশ্বাস করেন, কিয়ামতের আগে এক এমন যুগ আসবে, যেখানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। তখন কুফর ও ইসলাম অথবা অন্ধকার ও আলোর সংঘাত পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আবারও ইসলামের সুবাস ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীজুড়ে। তবে এমন চিন্তার মানুষরা কিন্তু কুরআনের আয়াত এবং হাদিসের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেছেন। কারণ, কুরআনের কোনো একটি আয়াত থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, একসময় ইসলাম ছাড়া বাকি বাতিল ধর্মগুলো ধ্বংস হবে। আর তখন দুনিয়াতে কুফর ও ইসলামের সংঘাত পুরোপুরি সমাপ্ত হবে; বরং

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–‘আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি। সুরা মায়েদা-১৪

এই আয়াত থেকে বুঝতে পারি, অমুসলিম, মুনাফিক ও বিভ্রান্ত মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এটিই আল্লাহর স্পষ্ট বক্তব্য। কুরআনে আরও এসেছে, শয়তান আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিল–‘فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। সুরা হিজর-৩৬

এই আয়াতও আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। ভবিষ্যদ্বাণী-সংবলিত হাদিসগুলোর ভাণ্ডারে যে জাল ও বানোয়াট হাদিসের আধিক্য রয়েছে, তা জ্ঞানীদের নিকট গোপন কিংবা অজানা কোনো বিষয় নয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞ গবেষকরা ভালোভাবেই অবগত। কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যতের কোনো সংবাদ হাদিসে আসতে পারে, কিন্তু কুরআনবিরোধী কোনো সংবাদ তো রাসূল (সা.)-এর জবানে কখনোই আসতে পারে না।এটা একটি অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা। আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে ইসলামের ইতিহাসের কোনো পৃষ্ঠা খালি নেই। আর খালি থাকা উচিতও ছিল না। এত এত ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে যেতে হয়েছে, সেগুলোর কলেবর অবিশ্বাস্য। ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা এর সাক্ষ্য দেবে। সুতরাং পৃষ্ঠা খালি থাকবেই-বা কীভাবে? যাহোক আমাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো, কীভাবে মুসলিম উম্মাহের ভেতরে ফিতনার সূচনা হয়েছিল, তা বর্ণনা করা ।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও মুখতার সাকাফিরাসূল (সা.) ঃ

-এর পর খলিফা হলেন আবু বরক সিদ্দিক (রা.)। এরপর অর্ধ জাহানের খলিফ আমিরুল মুমিনিন উমর (রা.)। তারপর খলিফ হলেন উসমান (রা.)। উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বাহ্যত শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। ৩০ হিজরি পর্যন্ত মুসলমানরা দুনিয়ার বড়ো বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বিজয় করে নিজেদের নেতৃত্ব ও শাসনে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। সেটার বিস্তৃতি এতটাই বিশাল ছিল যে, অবশিষ্ট থাকা অন্ধকার পৃথিবী এই আলোকিত অংশের মোকাবিলায় কোনো গুরুত্ব বা মূল্য রাখত না।সেই সময়

ইসলামের দুনিয়াবি শক্তি চাইলেই বাকি পুরো পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তিকে খুব সহজেই পরাজিত করতে পারত, কিন্তু তেমনটি হয়ে ওঠেনি কারণ, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের উত্তরসূরি ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সানআনি মুসলমানের বেশ ধরে। সে অন্য মুনাফিকদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে অসংখ্য নওমুসলিমকে ধোঁকা দেয় ।এই আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সানআনি প্রথমে সুকৌশলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একটি বড়ো ফিতনা ঢুকিয়ে দেয়। সে ফিতনার নাম হলো–গোত্রীয় জাতীয়তাবাদ ও বংশগত সাম্প্রদায়িকতা। অথচ এই দুটি বিষয়কে ইসলাম পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা আবারও সেগুলোকে জীবিত ও জাগ্রত করে। আর মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করে দেয়।নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং মুসলমানদের পারস্পরিক ভালোবাসাকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত বলেছেন। ইসলাম গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত করে বাপ-দাদার ক্ষতগুলো ভুলিয়ে মুসলমানদের এক জাতি বানিয়েছিল। তারা ছিল এক দেহের ন্যায়। তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং আল্লাহর কালিমাকে উচ্চকিত করা।এদিকে নতুন মুসলমানদের একটি বড়ো অংশ তখনও কুরআন ও তার প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত ছিল না। তখনও তাদের মধ্যে পিতৃপুরুষের অন্ধ আনুগত্য এবং জাহেলি সাম্প্রদায়িকতার জীবাণু পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি মুনাফিকদের এই ফিতনা নববি যুগেও স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের মধ্যে ছিল। কিছুদিনের জন্য হলেও সেগুলোর প্রভাব গুটিকয়েক মুসলমানের ওপর পড়েছিল। সেই মৃতপ্রায় ফিতনা এই সময় এসে নওমুসলিমদের ওপর জেঁকে বসল।নওমুসলিম ও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। আর এই পার্থক্যের নাম ইসলাম ও রুহানিয়াত। নওমুসলিমরা ইসলাম ও রুহানিয়াত থেকে ছিল বেশ দূরে। সুতরাং তারা এই ফিতনায় সহজেই ফেঁসে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মদিনা, বসরা, কুফা, দামেশক, কাহেরাসহ সব কেন্দ্রীয় শহরে কিছুদিন অবস্থান করে। এসব এলাকায় কৌশল ও সাবধানতার সঙ্গে উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়।তবে তার প্রচারণার ধরন ছিল একটু ভিন্ন। সে বলত, আলি (রা.) হলেন খিলাফতের প্রকৃত হকদার। সুতরাং তাঁর কাছেই খিলাফত আসা উচিত। এটা বলে বলে সে নওমুসলিমদের মধ্যে, বিশেষ করে বনু উমাইয়া ও বনু হাশেমেরমধ্যে পুরোনো শত্রুতা ও গোত্রবাদকে উসকে দেয় |এভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এসব কলুষিত চিন্তাকে সুকৌশলে সে আবার জীবিতকরে। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে স্পষ্টই বলেছেন–وَاعْتَصِمُوابِحَبْلِاللهِجَمِيعًاوَلَاتَفَرَّقُواوَاذْكُرُوانِعْمَتَاللهِعَلَيْكُمْإِذْكُنتُمْأَعْدَاءًفَأَلَّفَبَيْنَقُلُوبِكُمْفَأَصْبَحْتُمْبِنِعْمَتِهِإِخْوَانًاوَكُنتُمْعَلَىٰشَفَاحُفْرَةٍمِّنَالنَّارِفَأَنقَذَكُممِّنْهَاكَذَٰلِكَيُبَيِّنُاللَّهُلَكُمْآيَاتِهِلَعَلَّكُمْتَهْتَدُونَ -‘তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে। আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনগুলো স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পাও। সুরা আল ইমরান : ১০৩

[৩]রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে কুরাইশ ও আরবের নেতৃস্থানীয়দের বিশাল সমাবেশের উদ্দেশে বলেছিলেন–

‘হে কুরাইশ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের থেকে জাহেলি যুগের অহংকার এবং বাপ-দাদার গর্ব দূর করে দিয়েছেন। সব মানুষ আদমের সন্তান আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের মধ্যে গোত্র ও কবিলা বানিয়েছি, যেন তোমাদের পরিচয় পৃথক পৃথক হয়। আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সম্মানিত, যে বেশি মুত্তাকি।

[৪]আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সর্বপ্রথম মদিনা মুনাওয়ারায় অর্থাৎ খিলাফতের রাজধানীতে নিজের ভয়াবহ মতাদর্শ বা ধ্যানধারণার প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করল । কিন্তু তার কপাল খারাপ বলতে হবে। কারণ, এখানে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সংখ্যায় অধিক। মদিনায় তাঁদের প্রভাবই ছিল বেশি। তাই সে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। এখানে বরং তার এসব ধ্যানধারণা সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে হাশেমিরাই। তারা তাকে প্রত্যাখ্যানও করে ।মদিনা থেকে নিরাশ হয়ে সে পৌছল বসরায় । সেখানে ইরাকি ও ইরানি গোত্রগুলোর নওমুসলিমদের মধ্যে কিছুটা সফলতা পেল। সুতরাং এখানে নিজের সমমনা একটি দল তৈরির ফুরসত পায়। তারপর চলে যায় কুফায়। কুফার সেনাছাউনিতেও সব ধরনের মানুষ ছিল। সেখানেও সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি ফিতনাবাজ দল তৈরি

করতে সক্ষম হলো । তারপর সে কুফা থেকে চলে গেল দামেশকে। সেখানেও কিছুটা বিশৃঙ্খলা ছড়াল ।কিন্তুশামের তৎকালীন শাসক মুয়াবিয়া (রা.) তার সম্পর্কে জেনে সচেতন হয়ে যান। তিনি দ্রুতই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। ফলে সে বেশি দিন সেখানে থাকতে পারল না।তারপর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা গেল কাহেরায়। আর সেখানেই সে সফলতা পেল সবচেয়ে বেশি। এর পরিণতিতে বসরা ও কাহেরার ফিতনাবাজরা মিলে মদিনার দিকে যাত্রা শুরু করল। এরই ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা ।এই ফিতনা ৩০ থেকে ৪০ হিজরি পর্যন্ত মুসলমানদের গোত্রীয় সংঘাতে ব্যস্ত রেখে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজের ক্ষতি করল অপূরণীয়। আর মুসলমানদের মধ্যে বংশীয় ও গোত্রীয় রেষারেষি নতুনভাবে তৈরি করে কুরআনে কারিমের দিকে তাদের মনোযোগ কমিয়ে দিলো। ফলে যে রজ্জুকে শক্ত করে ধরতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, তার বাঁধন হয়ে গেল হালকা, ঢিলে ও নাজুক।হাসান (রা.) ৪১ হিজরিতে এই বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের খারাপ পরিণতি অনুভব করেন। ফলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সঙ্গীদের তৈরি করা ফিতনাকে সাহসিকতার সাথে রুখে দেন। এভাবে মুসলিম উম্মাহ আবারও এক কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এর পরের ২০ বছর নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করে। সেইসাথে স্থল ও জলপথে মুসলিমদের বিজয়াভিযানও অব্যাহত থাকে।এরপর আমিরুল মুমিনিন মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকাল, ইয়াজিদের ক্ষমতায় আরোহণ এবং কারবালার দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। এতে ষড়যন্ত্রকারীরা একদিকে মুশরিকদের এবং অন্যদিকে মুনাফিকদের আবারও সাহস দিয়ে কুকর্মে ব্যস্ত করে তোলে। ফলে এবার যে ঝড় এলো, তাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিক ও কাফিরদের খুব বেশি সফলতা আসেনি। কিন্তু মুনাফিকদের সংঘটিত ফিতনা প্রায় ১২-১৩ বছর অপূরণীয় ক্ষতি করে, যার ক্ষত ছিল অনেক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।প্রথম ঝড়, যা ৩০ থেকে ৪০ হিজরি পর্যন্ত ১০ বছর স্থায়ী ছিল। তখন বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। কিন্তু পরের এই ঝড় চলে ৬১ থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত। তখন আর সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা বেশি ছিল না। সে সময় কুরআনে কারিমের দিকে মুসলমানদের মনোযোগ কমে যায়। তারা জাগতিক মোহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই মুনাফিকরাও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কাজ করার সুযোগ পায় স্বাধীনভাবে।সে সময় মুসলমানরা খানায়ে কাবার অসম্মানকে নিজের প্রতিশোধস্পৃহার সামনে উপেক্ষা করে। শুধু তা-ই নয়, তারা বরং আবদুল্লাহ ইবনে সাবার উত্তরসূরি মুখতার মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দা সাকাফির মুশরিকি শিক্ষা এবং কুফরি দাবিকেও ইসলামের অংশ মনে করে। সুলায়মান ইবনে সারদ হাশেমি ও শিআরে আলিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে আইনুল ওয়ারদা যুদ্ধে হাজার হাজার মুসলমান নিহত হলো মুসলমানদের হাতেই।এই উল্লিখিত মুখতার সাকাফির কৃতকর্ম কী ছিল জানেন? সে হুসাইন (রা.)-এর ভাই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে ধোঁকা দিয়ে কুফায় নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করে। হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত এবং কারবালার ঘটনার হৃদয়বিদারক স্মৃতিকে মাধ্যম বানিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার গোপন ফিতনাকে সজীব করে তোলে ।এই ফিতনার একটি ধাপ ছিল গোত্রগত সাম্প্রদায়িকতাকে জীবন্ত করা। এভাবে সে নিজের বিপুল শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। তারপর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুফার শাসনক্ষমতা আলাবিদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে মুসলমানদের মুশরিক বানানো শুরু করে।মুখতার সাকাফি খুব চালাকির সাথে কুফাবাসীকে নিজের কারামত ও অস্বাভাবিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায়। কুফাবাসীর সাহায্যে কুফার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে নিজে কুফার শাসক বনে যায় ।আলি (রা.) যখন কুফায় অবস্থান করতেন, সেখানে তাঁর একটি চেয়ার ছিল। তিনি বেশির ভাগ সময় এটির ওপর বসতেন। ওই চেয়ার তাঁর ভাতিজাপুত্র ইবনে উম্মে হানি বিনতে আবু তালিবের কাছে ছিল। মুখতার তার কাছে চেয়ারটি চায়। কিন্তু তিনি ওই চেয়ার না দিয়ে একই রকম আরেকটি চেয়ার দেন। মুখতার ওই চেয়ার সামনে রেখে দুই রাকাত নামাজ পড়ে। তারপর তা চুম্বন করে। এরপর সে তার বাহিনীর সৈন্যদের একত্রিত করে। তাদের বলে, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাবুতে সাকিনাকে বনি ইসরাইলের সাহায্য ও বরকতের কারণ বানিয়েছিলেন, একইভাবে এই চেয়ারকেও শিআরে আলি (রা.)-এর নিশানি বানিয়েছেন। ফলে এখন আমরা সব জায়গায় বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হব। তাই আমাদের উচিত এই চেয়ারকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া।তার কথা শুনে লোকেরা ওই চেয়ারে চুম্বন করে। এমনকি এটির সামনে সিজদাও করে। মুখতার একটি সিন্দুক অত্যন্ত সুন্দর করে সাজিয়ে ওই চেয়ারের মসজিদে এটি রেখে দেয় এবং এর নিরাপত্তা দিতে একজন সেনা মোতায়েন ওপর রাখে। সিন্দুকটির মধ্যে লাগানো হলো রুপার তালা । এরপর কুফার জামে

করে। মসজিদে আসা মুসল্লিদের নামাজ শেষে ওই চেয়ারকে চুম্বন করাবাধ্যতামূলক করে দেয় ।মুখতার পর্যায়ক্রমে নিজের ইলহাম ও ওহির কথা মানুষকে বলা শুরু করল। এরপর জনগণের কাছে নিজের নবি হওয়ার স্বীকারোক্তি নিতে লাগল ।অতঃপর আলি (রা.)-এর জামাতা মুসআব ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর হাতে এই মুখতার মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া কুফায় পরাজিত ও নিহত হয়। মুসআব ইবনে জুবায়ের (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর ভাই। ঘটনাটি ছিল৬৭ হিজরির ১৪ রমজান ।ভেবে দেখার বিষয় হলো, তখনও বেশ কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও মুখতাব মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দা সাকাফি কুফাবাসীকে কীভাবে বিভ্রান্ত করতে পেরেছে!কুফার পুরো জনবসতি সৈন্য এবং বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ভাগ করা ছিল। এর একটি অংশ ছিল ইয়েমেন, হাজরামাউত, হেজাজ। আরবরা ছিল এই অংশের বাসিন্দা। এই আরবরা ইরানের অগ্নিপূজারি সাম্রাজ্যে পতনের পর মুসলমান হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে মদিনায় এসেছিল। কিন্তু তাদের মদিনায় না রেখে ইরানের সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ।কুফায় ইরাকি আরবের কিছু গোত্র ছিল। পূর্বে তারা ছিল ইরানি সাম্রাজ্যে অধীন। এই ইরাকি আরবরা মুসলমান হওয়ার পর ইসলামি বাহিনীতে শামি হয়। তাদের কখনো মদিনায় যাওয়ার সুযোগই হয়নি ।এ ছাড়া কুফায় কিছু ইরানির বসবাস ছিল। ইরান বিজিত হওয়ার পর তারা কু একটি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। এই এলাকাটি খুব দ্রুত একটি শহরে রূপ নেয়। কুফায় সাহাবায়ে কেরাম ও আলিমদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম; একেবারেই নামমাত্র। বিজয় ও বিলাসসামগ্রীর আধিক্যের কারণে কুফা কেন্দ্রীয় শহর হয়ে ওঠে। এজন্য এখানে অবস্থানরত সৈন্যদের কুফার স্থায়ী বাসিন্দা বানিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তারা পানিশূন্য মরু অঞ্চল এবং অখ্যাত বসতিতে ফিরে যাওয়ারচিন্তা বাদ দেয় ।তাদের প্রথম প্রজন্মের একটি বড়ো অংশকে কোনোভাবেই ইসলামি শিক্ষার পরিপূর্ণ আলিম বলা যায় না। কারণ, তাদের পুরো জীবন কেটেছে বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যস্ত থেকে। আর তারা জাহেলিয়াতের আবেগ থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল না। উপরন্তু ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজারিদের অনেকেই কুরাইশ ও আরবদের সাথে গোত্রগত বিরোধ পোষণ করত। তারাও ইসলামের শান-শওকতে প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু তারা ছিল পাক্কা মুনাফিক। ফলে মুসলমানদের ক্ষতি করতে তারা সব সময় সুযোগ খুঁজে বেড়াত। এজন্য কুফাই ছিল তাদের সবচেয়ে উত্তম জায়গা । এখানেই তারা নিরাপদে কাজ করতে পারত ।এই লোকেরা কোনো সময়ই নিজেদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত হতো না। মুনাফিক আবু জায়েদ ঈসায়ি মুখতারের ক্ষমতা দখলের কিছুকাল আগে এক মুসলমান (মুনাফিক) গভর্নরের সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত হয়। সে গভর্নরের আস্থা অর্জনের পর তাকে মদ্যপানের উৎসাহ দেয়। ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। আর গৃহযুদ্ধের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী নতুন প্রজন্ম কুফার উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছিল না ।উসমান (রা.)-এর শাহাদাত, আলি ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর দ্বন্দ্ব, উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিন যুদ্ধ, খারেজিদের বিশৃঙ্খলা, আলি (রা.)-এর শাহাদাত, কারবালার ঘটনা ইত্যাদি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নীলনকশা। তার ফিতনার পরিণতিতেই একের পর এক এমন খারাপ পরিস্থিতির তৈরি হয়। আর কুফাবাসীর সাথে ওইসব ঘটনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল ।কুফার জনসাধারণ তো বটেই, মক্কা ও মদিনার বিশেষ ব্যক্তিদেরও প্রভাবিত করেছিল উল্লিখিত ঘটনাগুলো। সাহাবায়ে কেরামের যে দল এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা থেকে আলাদা থাকতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও খুব স্বস্তিতে ছিলেন না। ইসলাম প্রচারে এবং কুরআন শিক্ষা দিতে যারা ব্যস্ত থেকেছেন, এই সমস্ত ঘটনা ও বিশৃঙ্খলা তাঁদের কাজকেও কিছুটা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল ।মোটকথা, কুফাবাসী যে মুখতারের ধোঁকায় পড়েছিল, এর অন্যতম কারণ হলো কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে গাফেল এবং ইসলামি জ্ঞানে অপূর্ণতা। এর কিছুদিন পরই কুফাবাসী ইলম হাসিল এবং কুরআনের দিকে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পেল। ফলে তখন তাদের মাঝে গড়ে উঠল বড়ো বড়ো আলিম ও প্রসিদ্ধ ইমাম ।আমি এই জায়গায় মুখতারের বিভ্রান্তি ও কুফাবাসীর ভুল কাজকর্মের ফিরিস্তি দেওয়া জরুরি মনে করেছি একটি কারণে। তা হলো—আমাদের সময়ের লোকেরা সব সময় বাপ-দাদা এবং নিজেদের পূর্ববর্তীদের নামের ওপর জীবন উৎসর্গ করাকে গর্বের বিষয় মনে করে। নিজের পূর্ববর্তীদের কোনো ভুল মেনে নিতে চায় না। ভেবে দেখুন, নববি যুগের এত নিকটবর্তী সময়ের মানুষও ইসলাম থেকে গাফেল হয়ে কত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কাজ করতে পারে। আর তারা মুনাফিকদের হাতে কীভাবে খেলনার পুতুল হয়ে যায় ।মানুষ আজকাল নিজেদের এবং বাপ-দাদাদের শুধু পুরোনো মানুষ হওয়ার কারণে ভুলত্রুটির উর্ধ্বে মনে করে। তাদের শরিয়াহবিরোধী কাজগুলোকে মনে করে ভালো ও উত্তম কাজ। এবার লোকেরা একটু চিন্তা করে দেখুক, কুফার

মানুষরা ছিল আমাদের তুলনায় অনেক বেশি নববি যুগের কাছাকাছি। তারা যদি ফিতনায় পড়ে যায় এবং মুখতারকে নবি মানতে পারে, তাহলে আমরা কতটা ঝুঁকিমুক্ত। এখনকার দিনের মুখতারের কোনো চিন্তা বা আকিদা কি ইসলামের অংশ হতে পারে?

সূরা ইবনে ইসহাক, সিরাতে ইবনে ইসহাক, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ৩১-৩২
ইবনে জারির তাবারি, তারিখে তাবারি খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২০

মুনাফিকদের ধারাবাহিক চক্রান্ত ঃ

ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সমর্থিত দলটির কিছু কার্যকলাপ তুলে ধরারপ্রয়োজন মনে করছি–এই দলটি বংশীয় সাম্প্রদায়িকতা, বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং গোত্রগত বিরোধকে জাগ্রত করেছে। এরপর মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন অনৈক্য ও দলাদলি তৈরি করার পর নিজের পক্ষে একটি পোক্ত দল বানিয়ে নিয়েছে।এই দলের লোকজন উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর আলি (রা.)-কে সাহায্য ও সমর্থনের ঘোষণা দেয়। এরপর তাঁর হাতে বাইয়াত নিয়ে তাঁরই সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তারা আলি (রা.)-এর আনুগত্য ও নির্দেশ কখনোই বাস্তবায়ন করেনি।এই দলটি সব সময় সুযোগ বুঝে আলি (রা.)-কে ধোঁকা দিয়েছে। তাঁর কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছে নানাভাবে।তারা নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে আলি (রা.)-কে অনেক ব্যস্ত রাখে। এর ফলে তিনি উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের ধরতে পারেননি; বিচারও করতে পারেননি। আবার এই দলটিই খলিফাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগ দেওয়াসুযোগ দেয়নি ।এই দলই সিফফিনের যুদ্ধের সময় আলি (রা.)-কে সফলতা অর্জন করতেবাধা দিয়েছে।তারপর এই দলই আবার যুদ্ধ মুলতবি করতে তাঁকে বাধ্য করেছে।আবার এই দলই আলি (রা.)-এর ওপর যুদ্ধ মুলতবি করার অভিযোগআরোপ করে মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছে।এই দলই খারেজি নাম ধারণ করে আলি (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আর সর্বশেষে তাঁর শাহাদতেরও কারণ হয়েছে।তারপর এই দলই হাসান (রা.)-এর বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।এই দলই কুফা ও বসরা ইত্যাদি সেনানিবাসকে নিজেদের ঘোড়দৌড়ের মাঠ এবং ইরাক ও পারস্যকে আশ্রয় নেওয়ার জায়গা বানিয়ে উমাইয়া ও হাশেমিদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে প্রস্তুত করেছে ধারাবাহিক লড়াইয়ের ক্ষেত্র। ফলে উমাইয়ারা সফল হয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য হাশেমিদের ময়দান থেকে বের করে দিয়েছে। সেইসাথে ব্যস্ত হয়েছে দ্রুত বিজয়াভিযানসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে।আলি (রা.)-এর লড়াই এবং তাঁর খিলাফতকালের বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনার প্রকৃত কারণ কী ছিল–খুব কম লোকই সেদিকে মনোযোগ দেয়। মুনাফিকদের এই শক্তিশালী দলের আনুগত্য ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সাজানো নীতির ওপর।মুনাফিকদের এই দলও উমাইয়াদের প্রতাপ ও শক্তির মোকাবিলায় নিজেদের প্রকাশ্য দুষ্কর্ম থেকে বিরত থেকে গোপন কার্যক্রম শুরু করে। উমাইয়ারা এই দলকে নিজেদের একটি বড়ো ভুলের কারণে গোপন কার্যক্রম চালানোর সুযোগ করে দিয়েছিল।উমাইয়াদের সেই ভুল ছিল ক্ষমার অযোগ্য। তারা খিলাফত ও ইসলামি নেতৃত্বকে একটি বিশেষ গোত্রের জন্য বিশেষায়িত ও সম্পর্কিত করে নিজেদের সন্তানদের পরবর্তী খলিফা বানানোর কুপ্রথা চালু করেছিল। আর এটাই মুনাফিকদের কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এর ফলে হাশেমিদের অন্তরে আরও বেশি প্রতিশোধস্পৃহা সৃষ্টি হয়।হাশেমিরা অসফল হয়ে এবং অধিকাংশ আরব গোত্রকে উমাইয়াদের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বী হতে দেখে নিজেদের মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহার সৃষ্টি করে। তারা এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দলকে নিজেদের কাজের হাতিয়ার বানায়। আর আরবদের জায়গায় ইরানিদের কাজে লাগানো জরুরি মনে করে।একদিকে বনু উমাইয়া নিশ্চিন্ত হয়ে বিজয়াভিযানের দিকে মনোযোগ দেয়, অন্যদিকে বনু হাশেম নিজেদের গোপন দল তৈরি এবং খিলাফতে বনু উমাইয়ার পতন ঘটনানোর উপায় খুঁজতে থাকে। ৭৩ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের পর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের খিলাফত শুরুহওয়ার সাথে সাথে বাহ্যত মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল।খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান নিজেও একজন আলিম এবং অনেক সাহাবির সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন। অন্যদিকে মদিনা, মক্কা, দামেশক এবং অন্য কেন্দ্রীয়

শহরগুলোতেও কোনো না কোনো সাহাবি ছিলেন। গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের একটি দল ইলমে দ্বীন অর্জনে এবং অন্য দলগুলো বিভিন্ন শহর ও রাজত্ব বিজয় করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের পর ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেক, তার পর সুলাইমান ইবনে আবদুল মালেক, তার পর উমর ইবনে আবদুল আজিজ, তার পর ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালেক এবং তার পর হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ক্ষমতায় আরোহণ করেন। হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ১২৫ হিজরিতে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।উমাইয়াদের এই ছয় খলিফার মোট সময়কাল ছিল ৫০ বছর। এই ৫০ বছরে মুসলমানদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি সব রকম উন্নতি হয়েছে। এই সময়ই আন্দালুস ও মরক্কো থেকে নিয়ে সিন্ধু, বলখ ও চীন পর্যন্ত প্রায় পুরো সভ্য পৃথিবী মুসলমানদের অধীনে চলে আসে।উমাইয়াদের এই ৫০ বছরের খিলাফত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য আজ পর্যন্ত পুরো সময়ের চেয়ে উত্তম ছিল। আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও শান-শওকতের জন্য ছিল সোনালি সময়। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, কল্যাণ ও বরকতের দিক থেকে খিলাফতে রাশেদার প্রথম ২৫ বছরের সাথে এই উমাইয়াদের সময় কোনোভাবেই তুলনীয় হতে পারে না।এই যুগ শেষ হওয়ার মাধ্যমে প্রথমত সব সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তারপর তাঁদের শিষ্যরা অর্থাৎ তাবেয়িরা তাঁদের স্থান দখল করে। অর্থাৎ তাবেয়িগণও দ্বীনের শিক্ষা ও হেফাজতের কাজে অধিক ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদেরও বেশির ভাগ এই সময়ের মধ্যেই বিদায় নিলে স্থলাভিষিক্ত হন তাবে-তাবেয়িগণ। কিন্তু ইসলামের এই অগ্রগতি ও বিজয়ের যুগও মুনাফিকদের ওই জ্বালানো আগুন গোত্র ও বংশীয় প্রতিহিংসাকে সজাগ করে দিয়েছিল। আর তা ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল সব সময়ই। খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের পর কিছু বছরের মধ্যেই এই আগুনের শিখা আরও বাড়তে থাকে। এই লেলিহান শিখা শুধু বনু উমাইয়ার খিলাফতকেই ধ্বংস করে হাশেমিদের আব্বাসীয় খান্দানকে খিলাফতে তখতে বসায়নি; তারা বরং ইসলামের একটি কেন্দ্রীয় শাসনকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে। আর ইসলামের সরল-সহজ বিশ্বাস ও আমলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ছিদ্র তৈরি করতে সফল হয়। এর ফলে জন্ম নেয় অনেকগুলো গোষ্ঠী ও জামাতের।

জাহেলিয়াতের যুগ :

মানবতার মুমূর্ষুদশা

খৃস্টীয় ষষ্ঠশতকের বিশ্ব এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ছিলো মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে' অন্ধকার যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ যে অধঃপতনের পথে চলেছিলো, এটা ছিলো তার শেষ ধাপ। পৃথিবীতে তখন এমন কোনো কল্যাণশক্তি ছিলো না, যা বিভ্রান্ত মানবতাকে হাত ধরে পথ দেখাবে এবং চূরান্ত পতন থেকে রক্ষা করবে, বরং দিন দিন তার পতন ও অধঃপতন গতি যেন বেড়েই চলেছিলো। খালিক, মালিক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মানুষ তখন নিজেকেই ভুলে গিয়েছিলো এবং নিজের পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কে হয়ে পড়েছিলো উদাসীন। সে হারিয়ে ফেলেছিলো তার স্বভাবগত বোধ ও বুদ্ধি এবং কল্যাণ অকল্যাণের বিবেচনাশক্তি। ভালো কী,মিথ্যা কী? তা যেন তার জানাই ছিলো না। আল্লাহর আদেশে নবিগণ হকের যে দাওয়াত দিয়েছিলেন, বাতিলের শোরগোলে তা চাপা পড়ে গিয়েছিলো বহু আগেই। মানুষের সমাজে হেদায়াতের যে বাতি তাঁরা জ্বেলেছিলেন, তাঁদের পর বাতিলের ঝড়-ঝাপটায় হয় তা নিভে গিয়েছিলো, কিংবা ছিলো নিভু নিভু। যুলমাতের ঘোর অন্ধকারে সেই নিভু নিভু প্রদীপ হয়তো দু' একটি হৃদয়ে কিছু আলো দিতে পারতো। কিন্তু ঘরে, পরিবারে, সমাজ ও জনপদে আলো তো দূরের কথা, ছিলো না সামান্য আলোর আভাস। দ্বীনের যারা ধারক ও বাহক তারাও পিছু হটে গিয়েছিলেন যিন্দেগির ময়দান থেকে এবং কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন মন্দিরে গির্জায় এবং ঘরের ইবাদতখানায়। তারাভেবে ছিলেন, এভাবে অন্তত নিজেদের দ্বীন-ঈমান রক্ষা পাবে যামানার ফিতনা থেকে এবং বাকী জীবন কেটে যাবে আরামে নির্ঝঞ্ঝাটে। আসলে এটা ছিল জীবনের বাস্তবতাও দায়-দায়িত্ব থেকে তাদের পলায়ন। এটা ছিলো ধর্মশাসন ও রাজশাসন এবং আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাদের কাপুরুষোচিত পরাজয়ের নামান্তর। এককথায়, প্রবল ঝড় তুফানের মুখে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং জনপদ ও জনসমাজের নেতৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। অল্পক'জন, যারা তখনো রয়ে গিয়েছিলো যিন্দেগির ময়দানে ঝড়তুফানের মাঝে, তারা ধরেছিলো সমঝোতার পথ, শাসক ও শোষকদের সঙ্গে। যুলুম শোষণ-নিপীড়নের ক্ষেত্রে তারা ছিল রাজশক্তির ধর্মীয় সহযোগী। অন্যায় পথে মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনে তারাও ছিল দুনিয়াদারদের সমান অংশীদার।এককথায়, তারা ছিল দ্বীনের বিক্রেতা ও দুনিয়ার খরিদদার। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এবং কালের বিবর্তনধারায় শাসন ও সিংহাসন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, পরিবার থেকে পরিবারে এবং জাতি থেকে জাতিতে বদল হতেই থাকে। কিন্তু শোষণ-নিপীড়ন এবং মানুষের উপর মানুষের শাসন চালানোর ক্ষেত্রে তারা যেহেতু একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ, তাই ক্ষমতার এই পালাবদলে মানবতার কিছু যায় আসে না। নীতি ও নৈতিকতার অবক্ষয় এবং জরা ও জড়তার পচনে যে জাতি আক্রান্ত, তদ্রুপ যুলুম-শোষন ও অনাচার-স্বেচ্ছাচারে যে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়েছে সেই সাম্রাজ্যের পতনে এবং সেই জাতির অধঃপতনে এ জগতসংসার না কখনো দুঃখবোধ করে, না কোনো শোক প্রকাশ করে, বরং এটাই বিশ্বজগত ও তার ঐশী ব্যবস্থার স্বভাবদী। কোনো রাজা ও রাজ্যের বিদায়ে মানুষের চোখ থেকে অশ্রু ঝরবে, চোখের অশ্রু এর চেয়ে অনেক মূল্যবান। মানবতার কল্যাণসাধনে যার কোনো কীর্তি ও কর্ম নেই; সভ্যতার উন্নতিবিধানে যার কোনো দান ও অবদান নেই তার শোকে বিলাপ করবে, সে অবসর কোথায় মানুষের! এসব ঘটনা তো অতীতে ঘটেছে বহুবার, ভবিষ্যতেও ঘটবে বার বার। নির্লিপ্ত আসমান-যমীন তা দেখে আসছে নিরবধিকাল-

كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ- وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ- وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَاكِهِينَ -كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ-
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ

কত বাগবাগিচা, কত ঝর্ণাধারা, কত ফল-ফসল এবং কত উন্নত স্থান তারা ছেড়ে গেছে এবং (ছেড়ে গেছে) কত নেয়ামত, যার ভোগে তারা মগ্ন ছিলো। এভাবেই অন্যকোন জাতিকে আমি এগুলোর উত্তরাধিকার দান করেছি, কিন্তু তাদের শোকে কাদেঁনি আসমান ও যমীন, আর তাদের দেয়া হয়নি অবকাশ। সুরা দোখান : ২৫-২৮

বরং এসব সম্রাট ও সাম্রাজ্য এবং জাতি ও নৃপতি পৃথিবীর জন্য ছিলো বোঝা, মানবজাতির জন্য ছিলো অভিশাপ এবং ক্ষুদ্র ও দুর্বলজনগোষ্ঠীর জন্য ছিলো আযাব। সভ্যতার দেহে তারা ছিলো রোগ-ব্যাধির উৎস, যেখান থেকে

দেহের রগ-রেশায় ছড়িয়ে পড়ে রোগ জীবাণু, এমনকি সুস্থ দেহেও ঘটে রোগের সংক্রমণ। এ অবস্থায় অনিবার্য হয়ে পড়ে কঠিন কোন অস্ত্রোপচার। রোগাক্রান্ত অঙ্গের কর্তন এবং সুস্থ দেহ থেকে তার অপসারণ, প্রকৃতপক্ষে এটা হলো রাব্বুল আলামীনের রাবূবিয়াত এবং তাঁর অসীম দয়া ও রহমতেরই অভিপ্রকাশ। এজন্য মানব-পরিবারের, বরং বিশ্বজগতের সকল সদস্যের অবশ্যকর্তব্য হলো রাব্বুল আলামীনের হামদ ও প্রশংসা করা এবং তাঁর প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِين

যে কাওম যুলুম করেছে তাদের গোড়া কেটে দেয়া হয়েছে, সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।
সুরা আন-আম ৬ ঃ ৪৫

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তো ছিলো নবুয়ত ও রিসালাতের বার্তাবাহী। মানবদেহের জন্য বিশুদ্ধ রক্ত যেমন, বিশ্বমানবতার জন্য তো তাদেরও ছিলো তেমনি প্রয়োজন! সুতরাং তাদের শাসন ও সাম্রাজ্যের পতন এবং তাদের জাতিগত অবক্ষয়-অধঃপতন নিছক একটি জাতি ও জনগোষ্ঠির এবং দেশ ও জনপদের পতন বা অধঃপতন ছিলোনা, বরং তা ছিলো একটি আদর্শের এবং একটি বার্তা ও রিসালাতের পতন, যা মানবসমাজেরজন্য রূহ ও প্রাণসমতুল্য। তা ছিলো এমন এক স্তম্ভের ধ্বস, যার উপর নির্ভর করে দ্বীন ও দুনিয়ার নেযাম ও ব্যবস্থাপনা। তো মুসলিম উম্মাহর পতন এবং জীবনের অঙ্গন থেকে তাদের অপসৃতি কি বাস্তবেই এমন কোন ঘটনা ছিলো, যার জন্য পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানবসমাজের শোকে সন্তাপে অশ্রুপাত করা কর্তব্য, ঘটনার এত যুগ, এত শতাব্দী পরও? বিশ্বজগত সত্যি কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই উম্মাহর পতনে,অধঃপতনে,বিশ্বের নেতৃত্ব থেকে তার অপসৃতিতে? অথচ এ বিশ্বে জাতি ও সভ্যতার এবং জনপদ ও জনগোষ্ঠীর তো কমতি নেই! কি ধরনের ক্ষতি ও দুর্গতি ছিলো তা? ইউরোপীয় জাতিবর্গ বিশ্বের শাসন ও নেতৃত্ব গ্রহন করার পর এবং মুসলিম সাম্রাজ্যে ধ্বংসাবশেষের উপর তাদের বিশাল বিস্তৃত নবসাম্রাজ্য গড়ে তোলার পর পৃথিবীর রূপ ও প্রকৃতি কী দাড়িয়েছে এবং মানবজাতি কী পরিণাম ও পরিণতির শিকার হয়েছে? বিশ্বের শাসন ও মানব জাতির নেতৃত্বে এই বিরাট পরিবর্তনের কী প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, দ্বীন-ধর্ম,আখলাক-চরিত্র,নীতি ও নৈতিকতা এবং শাসন ও জীবণ সর্বক্ষেত্রে? এক কথায় মানব ও মানবতার ভাগ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে? সর্বোপরি আগামী বিশ্বের গতি প্রকৃতিতে কী পরিবর্তন আসতে পারে যদি ইসলামী বিশ্ব জেগে ওঠে এবং পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর পতন-অধঃপতনের ঘটনা বারবার ঘটেছে। বহু রাজ্য ও সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়েছে। জনপদের পর জনপদ পদানতকারী বহু সম্রাট ও সেনাপতি একসময় চূরান্ত পরাজয় বরণ করেছে। কালের নির্মম থাবায় বহু সমৃদ্ধ সভ্যতা ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, এখন খোড়াখুড়ি করে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থিত করতে হয়। মোটকথা, জোয়ারের পর ভাটা এবং উত্থানের পর পতন প্রত্যেক জাকির ইতিহাসেই ঘটেছে। মানবজাতির সাধারণ ইতিহাসে এর উদাহরণের অভাব নেই। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর পতন ও অধঃপতন, এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে তাদের বিচ্যুতি, আর সর্বশেষে জীবণের কর্মমুখর অঙ্গন থেকে তাদের অপসৃতি, এটা কিন্তু ইতিহাসের বারবার দেখা সাধারণ কোনো ঘটনা নয়। এ এমন এক বিরল ঘটনা, যার নযির মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর নেই; অথচ যেকোনো বিরল ঘটনারই কোনো না কোনো নযির ইতিহাসের পাতায় খুজেঁ পাওয়া যায়। এ মর্মন্তদ ঘটনা ও বির্পযয় শুধু আরবদের নয়, এমনকি ঐসব জাতি ও জনগোষ্ঠীরও নয়,নিজ নিজ ধর্মত্যাগ করে ইসলামের পতাকাতলে যারা সমবেত হয়েছিলো; বিশেষ কোনো ঘর ও ঘরানার তো নয়ই,যারা শাসন ও সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে; বরং এ এমন ব্যাপক ও ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়, যার সাক্ষী হয়ে ইতিহাস নিজেও আজ স্তব্ধ। কারণ আগে বা পরে এমন করুণ ও নিদারুণ ঘটনার সম্মুখীন ইতিহাস আর কখনো হয়নি। বিশ্ব যদি এ বিপর্যয়ের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে পারতো; সাম্প্রদায়িকতা কুয়াসাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ব যদি নিজের ক্ষতি ও দুর্গতির গভীরতা ও গুরতরতা কিছুমাত্র বুঝতে পারতো, সর্বনাশের সেই দিনটিকে তাহলে সে কান্না ও বেদনার এবং শোক ও সন্তাপের দিবসরূপে গ্রহন করতো এবং বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠী একে অপরকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতো। এক কথায় সেটা হতো কালো পোশাক ধারনের বিশ্বশোকদিবস। কিন্তু এ বিপর্যয় একদিনে ঘটেনি,ঘটেছে ধীর পর্যাক্রমে,কয়েক যুগের দীর্ঘ সময়-পরিসরে। তদুপরি বিস্ব এখনো এ বিশ্ব এখনো এ বিষয়ের সঠিক মূল্যায়নের কোন উদ্যেগও গ্রহন করেনি। তাছাড়া নিজের বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের পরিমাণ নিরূপনের সঠিক মাপকাঠিও তার

জানা নেই। তাই এ বিষয়ে এখনো সে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির শিকার। আর অজ্ঞতা হলো বেদনা ও যন্ত্রণার বিরাট উপশম। জাতি হিসাবে যদিও আমরা আজ বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত এবং এখনকার বিশ্বশাসকদের দ্বারা চরমভাবে নিগৃহীত ও নির্যাতি, তবু আসমানি রিসালাতের দায়দায়িত্ব থেকে কোনভাবেই আমরা মুক্ত হতে পারি না। তাই আমাদের এখন দায়িত্ব হলো, বিশ্বের সামনে তার ক্ষতি ও দুর্গতির এবং বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের সঠিক চিত্র তুলে ধরা, যাতে সে অনুধাবন করতে পারে, মুসলিম উম্মাহর পতনের উল্লাসের মধ্য দিয়ে সে নিজে কি মহাসর্বনাশ ডেকে এনেছে! এ জন্য আইয়ামে জাহেলিয়াত, ইসলামের আবির্ভাব,মুসলিম উম্মাহের উত্থান ও পতনের কার্যকারণ, ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারনা অর্জন করতে হবে।

এক নজরে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম

পৃথিবীর বৃহৎ ধর্মগুলো তখন হয়ে পড়েছিলো ধর্মজীবি ও ধর্মবণিকদের স্বেচ্ছাচার ও প্রবৃত্তিপরতার শিকার। পদে পদে চলছিলো ধর্মের আদিপুরুষদের কোনভাবে ফিরে আসা সম্ভব হতো তাহলে নিজেদের রেখে যাওয়া ধর্ম তারাঁও চিনতে পারতেন না। বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ক্ষমতা ও শক্তির কেন্দ্রগুলো হয়ে পড়েছিলো শোষণ-নিপীড়ন এবং চরম অরাজকতা ওনৈরাজ্যের শিকার। তারা ব্যতিব্যস্ত ছিলো শুধু নিজেদের নিয়েই। বিশ্ব ও বিশ্বের জাতিবর্গের জন্য তাদের কাছে কোনো বাণী ও বার্তা ছিলো না। কারণ নীতি ও নৈতিকতা এবং আত্মা ও আত্মিকতার দিক থেকে তারা হয়ে পড়েছিলো দেওলিয়া। তাদের জীবন-নির্ঝর হয়ে পড়েছিলো বিশুষ্ক। ফলে তাদের নিজেদেরই জাতীয় সত্তার ছিলো না কোন প্রাণ সজীবতা এবং আত্মার শক্তি! তাদের কাছে না ছিলো আসমানী দ্বীনের কোন স্বচ্ছ ধারা, না ছিলো মানুষের তৈরী কোন সংহত শাসনব্যবস্থা।

<u>খৃস্টধর্ম,খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে</u>

মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং মনোজগতের যাবতীয় জটিলতা নিরসনের যোগ্যতার ক্ষেত্রে খৃষ্টধর্ম কখনো বিশদতা,ব্যাপকতা,স্পস্টতা ও স্বচ্ছতার এমন পর্যায়ে ছিলো না, যার উপর কোনো সভ্যতার 'ভিত' তৈরী হতে পারে, কিংবা যার আলোকে কোনো দেশ বা সমাজ সামনে অগ্রসর হতে পারে। তারপরো তাতে ছিলো হযরত ঈসা মাসীহের শিক্ষা ও আদর্শের ছিটেফোটাঁ এবং সহজসরল তাওহীদী বিশ্বাসের হালকা ছাপ। কিন্তু সেন্ট পল এসে সেই শেষ আলোটুকুও নিভিয়ে দিলেন। যে প্রতিমাপূজার পরিবেশে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং যে জাহেলিয়াত থেকে খৃস্টধর্মে প্রবেম করেছিলেন, সেখানকার নানা সংস্কার-কুসংস্কার এবং ভ্রষ্ট চিন্তা-বিশ্বাসের তিনি তাতে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এরপর কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার কাজটি সম্পন্ন করেছেনকনস্টান্টাইন। ফলে খৃস্ট ধর্ম হয়ে পড়ে গ্রীক কল্পকথা ও রোমান প্রতিমাবাদ এবং মিশরীয় প্লেটবাদ ও সন্ন্যাসবাদের অদ্ভুত এক মিশ্ররূপ। বলা যায়,খৃস্টধর্মে তখন সবকিছু ছিলো, ছিলো না শুধু ঈসা মাসীহের সহজ-সরল শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শ ও বিশ্বাস। সাগরে যেমন হারিয়ে যায় বৃষ্টি বিন্দু তেমনই তা হারিয়ে গিয়েছিলো বহুমুখী জলের ঐ জলাশয়ে। খৃস্টধর্ম তখন হয়ে পড়েছিলো বিক্ষিপ্ত কিছু চিন্তা-বিশ্বাস ও আচার-সংস্কারের সমষ্টি, যাতে না ছিলো রূহ ও আত্মার প্রয়োজনীয় খাদ্য, পুষ্টি না ছিলো আকল-বুদ্ধি এবং ভাব ও আবেগের চাহিদা পূরণের পর্যাপ্ত উপকরণ। এগুলো না পেরেছে জীবনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে, না পেরেছে জাতি ও সভ্যতার চলার পথ আলোকিত করতে; বরং মুর্খ ধর্মনেতা ও ধূর্ত ধর্মবণিকদের লাগাতার হস্তক্ষেপের ফলে একসময় তা হয়ে পড়েছিলো জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ, হয়ে পড়েছিলো মানুষ এবং তার মুক্তবুদ্ধি ও সুস্থ চিন্তার মাঝে অন্তরায়। এমনকি বহু শতাব্দির ধারা প্রবাহে একসময় তা হয়ে পড়ে নিছক প্রতিমানির্ভর একটি ধর্ম। পবিত্র কোরআনের ইংরেজী অনুবাদক শেল খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের নাছারাদের সর্ম্পকে বলেন-

'ধর্মজাযকদের পূজা এবং খৃস্টের ছবি ও প্রতিমার উপাসনা করার ক্ষেত্রে খৃস্ট সম্প্রদায় বড় সীমাছাড়া হয়ে পড়েছিলো, এমনকি এ যুগের ক্যাথলিকদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ

পরবর্তীকালের খৃস্টধর্মের মৌলিক ও পার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয়ে এমন প্রবল বির্তক ও কলহ দানাবেধেঁ উঠেছিলো যে, গোটা জাতির চিন্তা-চেতনা তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। যদিও তাতে অন্তসার বলে কিছু ছিলো না তবু তা গোটা জাতির মেধা,যোগ্যতা ও কর্মশক্তি একরকম গ্রাস করে ফেলেছিলো। এসব তর্ক যুদ্ধ সুযোগে সুযোগে অস্ত্রযুদ্ধের ভয়ার রূপ ধারন করতো, যার পরিণতি ছিলো নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা ও রক্তপাত। মানুষের জানমাল এমনকি ইজ্জত-আবরু পর্যন্ত লুন্ঠিত হতো ধর্মযুদ্ধের হাতে। গীর্জা ও ধর্মচর্চার কেন্দ্রগুলো প্রতিদ্বন্দ্বী ও যুদ্ধমান ধর্মীয় দল ও উপদলের সমরশিবিরে পরিণত হয়েছিলো। এভাবে গোটা সাম্রাজ্য নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো ভয়াবহ এক গৃহযুদ্ধে। এই ধর্মীয় বিরোধ-বিবাদের উৎকটতম প্রকাশ ঘটেছিলো রোমান ও সিরিয়ান এবং মিশরীয় খৃস্টানদের মধ্যে; আরো সঠিক ভাষায় রাজধর্ম ও মানুবাদের মধ্যে। রাজধর্মের মূল বিষয় ছিলো যিশুখৃস্টের দ্বৈতসত্তায় বিশ্বাস,পক্ষান্তরে মানুবাদীরা বিশ্বাস করতো, তিনি একটি মাত্র সত্তা ধারন করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সত্তা, যার মাঝে তার মানবীয় সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে; বড় জলপাত্রে একফোঁটা দুধ যেমন।

দু'দলের এ বিরোধ-সংঘাত খৃস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম মতকে এমনই চরম আকার ধারন করেছিলো, যেন তা পরস্পরের বিনাশকামী দু'টি ভিন্ন ধর্মের যুদ্ধ,কিংবা (কোরআনে বর্ণিত) ইহুদী-নাছারাদের ধর্মীয় বিরোধ, যাতে ইহুদীদের দাবী ছিলো, নাছারা কোন ধর্মের উপর নেই, আর নাছারাদের জবাব ছিলো, ইহুদীরা কোন ধর্মের উপর নেই।

ডঃ আলফ্রেড জি, বাটলার বলেন, 'ঐ দু'টি শতাব্দী ছিলো মিশরীয় ও রোমানদের মধ্যে লাগাতার রক্তক্ষয়ী সজ্ঘাত-সর্জ্ঘষের যুগ, যার ইন্ধন ছিলো জাতিগত ভিন্নতা এবং ধর্মীয় বিরোধ, তবে দ্বিতীয়টিই ছিলো প্রবলতর। কেননা সে যুগের সর্বরোগের মূলই ছিলো রাজবাদ ও মানুবাদের হিংস্রতা। প্রথমটি ছিলো যেমন নাম থেকে বোঝা যায়, রোমান সাম্রাজ্যের রাজধর্ম এবং সার্বজনীন প্রজাধর্ম, যার মূল কথা হলো যিশুখৃস্টের স্বভাব সত্তার দ্বৈততা। এ ধর্মবিশ্বাস ছিলো সনাতন ও পরম্পরাপূর্ণ। পক্ষান্তরে মিশরীয় মানুবাদীরা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখান করতো; এমনকি এর প্রতিরোধে তারা এমন পাশবিক উন্মত্ততা ও জিঘাংসার পরিচয় দিয়েছিলো যা আমাদের পক্ষে আজ কল্পনা করাও সম্ভব নয়। পবিত্র ইন্‌জীলে বিশ্বাসীরা দূরে থাক, নূন্যতম বিবেকের অধিকারী কোন সম্প্রদায়ও কিভাবে পাশবিকতার এমন স্তরে নামতে পারে তা ভেবে পাই না।

ছয়শ আটাশ খৃস্টাব্দে পারসিকদের উপর বিজয় লাভের পরে সম্রাট হিরাক্লিয়াস (৬১০-৬৪১) সাম্রাজ্যের বিবাদমান ধর্মসম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ঐক্যবিধান ও সমন্বয়সাধনের এক জোরালো উদ্যেগ গ্রহন করেন। তার সমন্বয় প্রচেষ্টার ভিত্তি ছিলো যিশুখৃস্টের স্বভাব ও সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা ও বিতর্কপরিহার করা। অর্থাৎ তিনি কি একক সত্তার অধিকারী না দ্বৈত সত্তার। এ বিষয়ে কোন পক্ষ নিজস্ব মত প্রচার করবে না; তবে সকল পক্ষের জন্য এ বিশ্বাস গ্রহন করা বাধ্যতামূলক যে, 'ইশ্বর'- তাঁর রয়েছে একক ইচ্ছা এবং একক কার্য-ক্ষমতা।

ছয়ম একত্রিশ খৃস্টাব্দের শুরুতে ঐক্যমত স্থির হলো এবং এটাই সাম্রাজ্য ও গীর্জার অনুসারীদের রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করলো। অন্যসব ধর্মমতের উপর এই নতুন ধর্মমত চাপিয়ে দেয়ার জন্য সম্রাট হিরাক্লিয়াস বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং এজন্য সর্বউপায় অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু কিবতীরা এটাকে ধর্মবিকৃতি আখ্যা দিয়ে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং নিজেদের পুরোনো ধর্মবিশ্বাস রক্ষার জন্য প্রাণপণ প্রতিরোধ অবতীর্ণ হয়েছিলো।

অবশেষে সম্রাট হিরাক্লিয়াস দ্বিতীয় উদ্যেগ গ্রহণ করলেন এবং কিছুটা ছাড় দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'ইশ্বর'-তার রয়েছে একক ইচ্ছা, এ বিশ্বাস গ্রহন করাই যথেষ্ট।দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ ইচ্ছাকে কার্যকর করার ক্ষমতা, তো এ বিষয়টি মুলতবী রেখে এ সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্কের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন, এমনকি তিনি রাজকীয় ফরমানরূপে প্রাচ্যদেশের সব অঞ্চলে তা প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাতেও মিশরের গণঅসন্তোষ প্রশমিত হলো না। মিমরে সাইরাসের দীর্ঘ দম বছরের শাসনকাল ছিলো নিষ্ঠুরতম নিপীড়ন-নির্যাতনের যুগ। তকন এমন সব লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে যা শুনলে এখনো শরীর কাটাঁ দিয়ে ওঠে। হাজার হাজার মানুষকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হতো। ঝুলন্ত মানুষকে আগুনে ঝলসানো হতো এবং চর্বি গলে গলে আগুন নিভে যেত। কখনো বস্তায় ভরে

‘অপরাধী’কে নিক্ষেপ করা হতো সমুদ্রে। এ ধরনের অসংখ্য নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার কাহিনীতে ইতিহাস ভরপুর।

রোমান শাসনে মিশরঃ ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা

মিশর ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের অধীন খুব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। নীলনদের কল্যাণে দেশটি ছিলো সুজলা,সুফলা ও উর্বরা। কিন্তু রোমকদের যুগপৎ শাসন-শোষণ ও ধর্মীয় নিপীড়নের ফলে সপ্তম শতকে মিশরই ছিলো আল্লাহর যমীনে সবচেয়ে দুর্ভাগা দেশ। খৃস্টধর্ম মিশরকে কিছুই দিতে পারেনি।দিয়েছে শুধু যিমুর সত্তাগত প্রকৃতি,ইশ্বরতত্ব এবং অতিপ্রাকৃত দর্শনবিষয়ক ব্যাপক কোন্দল ও বিবাদ-বিতর্ক, যা সপ্তম শতকে বীভৎসতম রূপ ধারণ করেছিলো এবং মিশরীয় জাতির চিন্তাশক্তিকে স্থবির ও কর্মশক্তিকে নিস্তেজ করে দিয়েছিলো। পক্ষান্তরে রোমান শাসন তাদের দিয়েছিলো শুধু ধর্মীয় নিপীড়নের বিভীষিকা এবং রাজনৈতিক শাসন-শোষণ ও দাসত্বের বীভৎসতা। মাত্র দশ বছরে মিশর যে ভয়াবহ ধর্মীয় নিপীড়ন ও রাজনৈতিক শাসন-শোষণ এর শিকার হয়েছে ইউরোপ ধর্মীয় তদন্তের যুগে কয়েক দশকেও তা ভোগ করেনি। ফলে জীবনের সার্বজনীন সৃজনশীলতা থেকে এবং ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সাধনায় উত্তরণের ক্ষেত্রে মিশর একেবারেই পিছিয়ে পড়েছিলো। রোমান উপনিবেশ হওয়া সত্বেও তার যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার ছিলো না, তেমনই ছিলো না খৃস্টধর্মের অনুসারী হওয়া সত্বেও ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার। ডঃ গ্যাস্টপ লেভন বলেন-

‘বলতেই হবে, মিশরকে খৃস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিলো এবং এর ফলে সে অবক্ষয়ের অতলে চলে গিয়েছিলো, ইসলামের বিজয়াভিযানের আগে যা থেকে সে আর উদ্ধার পায়নি। নানা ধর্মীয় বিবাদ-বিতর্কের বেড়াজালে আটকা পড়ে মিশর হয়ে পড়েছিলো চরম দুর্দশার শিকার। কারণ দল উপদলগওলো ছিলো ভয়ঙ্কর হানাহানি ও সজ্ঞাত-সজ্ঘর্ষে লিপ্ত। ফলে ধর্মীয় বিভক্তি এবং শোষণ নিপীরনে বির্পযস্ত মিশর রোমকদের প্রতি চরম বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলো এবং রোমান শাসনের থাবা থেকে মুক্তি লাভের প্রহর গুণছিলো।

ডঃ আলফ্রেড জি, বাটলার বলেন, ‘সপ্তম শতকে ধর্ম সমস্যা ছিলো মিশরীয়দের কাছে রাজনৈতিক সমস্যার চেয়ে গুরুতর। কেননা রাজক্ষমতা ও রাজ্যশাসনকে কেন্দ্র করে দল-উপদল ও বিবাদ কোন্দল সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে ধর্মীয় চিন্তাধারা ও মতবিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে। আর ধর্মকে মানুষ এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতো না যে, তা পওণ্য কর্মের সহায়ক, বরং তাদের কাছে ধর্ম ছিলো কিছু মৌলিক বিষয়ের তত্ব-বিশ্বাস।

ফলে যাবতীয় বিরোধ ও তর্ক-বিবাদ ছিলো নানান বিশ্বাসের বিশ্বাসের মধ্যে সূক্ষ্ম-জটিল পার্থক্য ও কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারার ভিত্তিতে। এমনকি অর্থহীন ও দুর্বোধ্য বিভিন্ন বিষয় এবং ধর্মের মূল ও অতিপ্রাকৃত দর্শনের চুলচেরা পার্থক্যকে উপলক্ষ্য করে তারা জীবন দিতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না।

অন্যদিকে রোমানরা মিমরকে গ্রহন করেছিলো শুধু দুধের বকরীরূপে। তারা দুধ দোহন করতো শেষ ফোঁটা পর্যন্ত। ঘাস ও দানা-পানি যা খাওয়াতো তা শুধু এ জন্য যে ওলানে দুধ ভালো করে জমে। মিশরে তাদের কাজ ছিলো শুধু মিশরীয়দের সম্পদলুন্ঠন ও রক্তশোষণ। আলফ্রেড জে বাটলারের নিচের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট-

‘রোমরা মিশর থেকে মাথাপিছু খাজনা ও বিভিন্নমুখী কর উশুল করে নিতো এবং নিঃসন্দেহে তা ছিলো মানুষের সাধ্যাতীত, আর তা আরোপ করা হতো সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে।

হিস্টোরিয়ানস হিস্টোরি অব দা ওর্য়াল্ড এর লেখগণ বলেন-

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজভান্ডারে মিশর তার উৎপাদিত সম্পদের বিরাট অংশ জমা দিতো। মিশরীয় কৃষকশ্রেণী যদিও সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অদিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো তবু তারা কর ও খাজনা দিতে বাধ্য ছিলো। উচ্চহারের ভূমিখাজনা ছাড়াও ছিলো। উচ্চহারের ভূমিখাজনা ছাড়াও ছিলো বিভিন্ন কর। ফলে এ সময়কালে মিশরের সম্পদ হয়ে পড়েছিলো ক্রমসঙ্কোচনশীল।

এভাবেই মিশর নিষ্পেষিত হচ্ছিলো একাধারে ধর্মীয় নিপীড়ন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার ও অর্থনৈতিক শোষনের জাঁতাকলে। ফলে জনগণ নিছক বেচেঁ থাকার সংগ্রামেই ছিলো ব্যাতিব্যস্ত। তাদের জীবণে নেমে এসেছিলো চরম দুর্দশা এবং তারা হয়ে পড়েছিলো সর্বপ্রকার সুশীল চিন্তা সম্পর্কে উদাসীন।

আবিসিনিয়া :
মিশরের প্রতিবেশী দেশ আবিসিনিয়া,আরবের কাছে তার পরিচয় ছিলো হাবশা নামে। হাবাশার জনগোষ্ঠীও মানুবাদের অনুসারী ছিলো। তদুপরি তারা অসংখ্য প্রতিমার উপসনা করতো, একত্ববাদের নামে যা কিছু ছিলো তা প্রতিমাবাদেরই উন্নত রূপ ছাড়া আর কিছু ছিলো না, তবে তার উপর খৃষ্টধর্মের তত্ব ও পরিভাষার আবরণ ছিলো। তাদের মধ্যে না ছিলো আধ্যাত্মিক প্রাণ ও প্রেরণা, না ছিলো জাগতিক উচ্চাভিলাষ। বরং নিকা ধর্মসম্মেলনের সিদ্ধান্ত ছিলো, ধর্মীয় বিষয়ে আবিসিনিয়ার নিজস্ব কোন সত্বা নেই, বরং তা হবে রাজসভার সর্ম্পূণ অনুগত।
হাবাশার কর্তব্য ছিলো শুধু রোমানদের সেবার জন্য প্রচুর পরিমাণে কালো ও কমর্ঠ দাস সরবরাহ করা। মিশরে যাও কিছু ধর্মীয় উত্তাপ ছিলো, হাবাশায় তাও ছিলো না। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো শোচনীয়, কিন্তু ধর্মীয় অবস্থা ছিলো আরো শোচনীয়।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জাতিগোষ্ঠী :

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম জনপদে যেসব জাতির বসবাস ছিলো, এককথায় তারা ছিলো অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং ছিলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহে বিপর্যস্ত। জ্ঞান ও সভ্যতার ঊষার আলো তাদের ভাগ্যকাশে উদিত হতে তখনো অনেক দেরী। কেননা দুর্ভাগা ইউরেপের মানচিত্রে তখনো আমাদের 'উন্দুলুস'-এর অভ্যুদয় ঘটেনি, ইউরোপকে যারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলো উপহার দিয়েছিলো এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এনেছিলো। যুগের বিভিন্ন দুর্যোগ এবং ইতিহাসের ঝড়ঝাপটা, যা কোনো জাতিকে ঘোর থেকে জাগিয়ে তোলে এবং এগিয়ে চলার যোগ্যতা দান করে তাও ছিলো তাদের জাতীয় জীবণে অনুপস্থিত। তারা শুধু ক্ষতবিক্ষত ছিলো খুনাখুনি, হানাহানি ও রক্তক্ষয়ী গৃহ-যুদ্ধে। মানব সভ্যতার চলমান কাফেলার যে রাজপথ, তা থেকে তারা ছিলো দূরে বহুদূরে। সমকালীন পৃথিবী সম্পর্কে তারা ছিলো প্রায় অজ্ঞ; পৃথিবীও বলতে গেলে জানতো না তাদের কোনো খবর। প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জনপদে ইতিহাসের মোড় পরিবর্তক যে সকল ঘটনা ঘটছিলো সেগুলোর সঙ্গে তাদের না ছিলো কোন যোগ, না ছিলো যোগাযোগ। চিন্তা ও বিশ্বাসের দিক থেকে তারা ছিলো নবীন খৃস্টধর্ম ও প্রাচীন মূর্তিপূজার মাঝামাঝি অবস্থানে। ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন তাদের কাছে কোন বাণী ও বার্তা ছিলো না, তেমনি রাজ্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও ছিলো না নিজস্ব কোন ব্যবস্থা ও দর্শন। এইচ, জি ওয়েলস যেমন বলেছেন,'পশ্চিম ইউরোপে তখন একতা ও ঐক্য এবং আইন ও শৃঙ্খলার চি ছিলো না। রবার্ট ব্রিফল্ট (ৎড়নবৎঃ নৎরভভধঁষঃ) বলেন-
'পঞ্চম শতক থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ছিলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং ক্রমশ তা ঘোর থেকে ঘোরতর হয়ে চলেছিলে। সে যুগের পাশবিকতা ও বর্বরতা ছিলো আদি যুগের চেয়ে অনেক ভয়াভহ। যেন পচনধরা সভ্যতার লাশ পচেই চলেছে। যা কিছু ভালো সব মুছে যাচ্ছে এবং ধ্বংস ও বিলুপ্তির অবধারিত হয়ে পড়েছে। যে সকল সমৃদ্ধ জনপদে ঐ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো এবং একসময় চরম উন্নতি লাভ করেছিলো,যেমন ইটালি ও ফ্রান্স, সেগুলো তখন হয়ে পড়েছিলো গোলযোগ, নৈরাজ্য ও বরবাদির শিকার

যে সমাজে মুহম্মদী নবুয়তের আর্বিভাব :

মানবতা যকন মুমূর্ষদশায় উপনীত হয়েছিলো এবং মানুষের এই পৃথিবী যখন সমস্ত চাকচিক্য ও জাঁকজমকসহ ধ্বংস ও বরবাদির অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে চলেছিলো, গোটা মানব জাতি যখন আধাঁর রাতের মুসাফিরের মতো দিশেহারা অবস্থায় ছিলো এবং মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলো না, বরং উপায় খোজাঁর যোগ্যতাও ছিলো না, ঠিক সেই চরম মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর রহমতের দরজা খুলে দিলেন এবং মুহাম্মদ ছাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমাতুল-রিল আলামীনরূপে এবয় আখেরী নবী রূপে দুনিয়াতে পাঠালেন, যাতে মুমূর্ষ মানবতাকে তিনি নবজীবন দান করেন এবং মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন। আলকোরআনের ভাষায়-

‘আলিফ-লাম-রা, এ তো সেই কিতাব যা আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি,যাতে সমস্ত মানুষকে আপনি তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, মহা-পরাক্রমশালী মহা প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে।

নবুয়ত লাভের সময় যে পৃথিবীর তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন, কেমন ছিলো সেই পৃথিবী? কেমন ছিলো পৃথিবীর মানুষ? কেমন ছিলো সমাজ,সভ্যতা ও তার অন্ধকার? যিনি বলেছেন বড় সুন্দর বলেছেন- পৃথিবীটা যেন ছিলো এক বিশাল ভবন,যা প্রবল কোন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে, যার আসবাবপত্র সব তছনছ হয়ে গিয়েছে। কোন কিছু যথাস্থানে নেই, বরং যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কোন কিছুই ব্যবহার উপযোগী নেই; হয় ভেঙ্গেচুরে, না হয় দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। স্তূপ ও ধ্বংস্তূপ ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই।

আল্লাহর নবী যখন নবুয়তের দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকালেন,দেখতে পেলেন এমন সব মানুষ যাদের কাছে নিজেদের মানব সত্তাই ছিলো মূল্যহীন। তারা ভুলে গিয়েছে আপন স্রষ্টাকে এবং নিজেদের সৃষ্টি-মর্যাদাকে। তাই তারা পূজা শুরু করেছে চাঁদ-সূর্যের,নদী-সাগরের,আগুন-পাথরের, কারো ক্ষতি-উপকারের কোন ক্ষমতা নেই যাদের।

তিনি দেখতে পেলেন এমন সব মানুষ যাদের চিন্তা-চেতনা হয়ে গিয়েছে বক্র এবং রুচি ও স্বভাব হয়ে পড়েছে বিকৃত। ফলে সহজ সত্যকে মনে হচ্ছে দুর্বোধ্য এবং দুর্বোধ্যকে সহজ সত্য। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ছিলো তাদের দ্বিধা-সংশয়, আর যা কিছু সন্দেহযোগ্য তাতে ছিলো অটল বিশ্বাস। অসুন্দর ছিলো তাদের চোখে সুন্দর, আর যা কিছু শোভন-সুন্দরতা ছিলো অসুন্দর। যা কিছু অখাদ্য-কুখাদ্য,তাদের কাছে মনে হয় সুখাদ্য, আর সুখাদ্যকে মনে হয় অখাদ্য। কল্যাণকামী বন্ধুকে তারা শত্রু ভেবে দূরে সরিয়ে দেয়, আর প্রানঘাতী শত্রুকে বন্ধু ভেবে কাছে টেনে নেয়।

চার পাশে তিনি দেখতে পেলেন এমন এক সমাজ, যা বৃহৎ বিশ্বেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ।সব কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সবকিছু উল্টে গিয়েছে। সেখানে নেকড়ে হয়েছে মেষপালের রক্ষক এবং অপরাধীর হাতে চলে এসেছে বিচারের দন্ড। যারা পাপাচারী ও দুষ্কৃতিকারী তারা হলো সবল স্বচ্ছল; যারা সৎ ও সদাচারী তারা হলো বঞ্চিত দুর্বল। সমাজের চোখে যেন সততার চেয়ে মন্দ এবং শঠতার চেয়ে উত্তম কিছু আর নেই। সরলতাকে মনে করা হয় নির্বুদ্ধিতা, আর ধূর্ততাকে ভাবা হয় কুশলতা।

সমাজদেহে এমন সব দুষ্ট ব্যাধি বাসা বেধেঁছে যা মানবতার ধ্বংসকেই শুধু তরান্বিত করছে এবং আশা ও আশ্বাসের সব আলো নিভিয়ে এমন অন্ধকার গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকে না। সেখানে মদ ও মদাসক্তি ছিলো, নগ্নতা ও বেহায়াপনা ছিলো, লোভ-লালসা ও নিষ্ঠুরতা ছিলো, সুদের নামে শোষণ ও লুন্ঠন ছিলো। পাশবিকতা ও হিংস্রতা ছিলো। এতীমের কান্না ছিলো, দুর্বলের ফরিয়াদ ছিলো, অবলা নারীর আহাজারি ছিলো এবং পঁতে ফেলা জীবন্ত কন্যা সন্তানের আর্তনাদ ছিলো। মোটকথা নীচতা,হীনতা,জঘন্যতা ও বীভৎসতার যত রূপ হতে পারে,ঐ সমাজে তার সবই ছিলো এবং সদম্ভে ছিলো।

তিনি দেখতে পেলেন, যারা ছিলো রাজা ও শাসক তারা হয়ে পড়েছে শোষক ও উৎপীড়ক। আল্লাহর যমীন যেন তাদের জন্য ছিলো শিকারভূমি, আর আল্লাহর বান্দারা তাদের অসহায় শিকার। যাদের হাতে ছিলো দ্বীনও ধর্মের দায়িত্ব,খোদার পরিবর্তে তারাই দাবীদার সেজেছে খোদায়িত্বের। ধর্মের নামে নির্দ্বিধায় তারা আত্মসাৎ করছে মানুষের ধনসম্পদ এবং মানুষকে সরিয়ে রাখছে আল্লাহর পথ থেকে।

তিনি দেকতে পেলেন, আল্লাহ-প্রদত্ত মানবপ্রতিভার বড় নির্দয়ভাবে অপচয় হচ্ছে, কিংবা হচ্ছে অপব্যবহার। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তা সঠিক খাতে পরিচালিত এবং সঠিক কাজে নিয়োজিত নয়। মানুষের যাবকীয় মেধা ও প্রতিভা মানবজাতি ও মানবসভ্যতার কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে ডেকে আনছে তার চরম সর্বনাশ।সাহস ও বীরত্বের প্রকাশ ঘটছে যুলুম অত্যাচারের পথে। দানশীলতা ও বদান্যতার প্রকাশ ঘটছে অপচয় ও অপব্যয়ের মাধ্যমে, আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ ঘটছে জাহেলিয়াতের অহমিকায়। মেধা ও বুদ্ধির প্রকাশ ঘটছে অপরাধের নব নব কৌশল এবং প্রবৃত্তির চরিতার্থতার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে।

বস্তুত বহু গুণ ও যোগ্যতার আধার মানুষ ছিলো এমন মহামূল্যবান কাচাঁমাল যা কাজে লাগানোর জন্য ছিলো না কোন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কারিগর,যিনি সভ্যতার বির্নিমাণে এগুলোর সঠিক ব্যবহার করতে পারেন।কিংবা মানুষ যেন ছিলো উৎকৃষ্ট কাঁচা কাঠ,যা রোদ-বৃষ্টিতে পচে গলে শেষ হচ্ছে, কিন্তু এমন কারো উপস্থিতি ছিলো না যিনি

এগুলোকে শুকিয়ে জোড়া দিয়ে জাহাজ তৈরি করবেন, আর সে জাহাজ জীবনসমুদ্র পড়ি দিয়ে মানবতাকে নিয়ে যাবে অনন্ত সৌভাগ্যের আলোকিত বন্দরে।
পৃথিবীর সব জাতি ও জনগোষ্ঠী ছিলো রাখালহীন মেষপাল, যাতে ক্ষুর্ধাত নেকড়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে বারবার। রাজনীতি যেন ছিলো লাগামহীন পাগলা ঘোড়া এবং শাসনক্ষমতা যেন মাতালের হাতে তলোয়ার, যা জখম করে আপন-পর সবাইকে, এমনকি কখনো নিজেকে।

দ্বিতীয় শতকে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থাঃ

এই শতকে কুরআন ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের দিকেও মুসলমানরা ঝুঁকে পড়েছিল। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর হাদিসের ব্যাপারে তখনও পূর্বের রীতিই চলছিল। আর সেই নীতি ছিল, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িগণ নিজেরা হাদিস সংরক্ষণ করতেন। মুখে মুখে ছাত্র ও অনুসারীদের স্মরণ করাতেন এবং মানুষকে শোনাতেন।ইজতিহাদি মাসায়েলের ক্ষেত্রে আলিমদের ফতোয়া হতো ভিন্ন ভিন্ন। কখনো কখনো এই মতানৈক্যের কারণ হতো হাদিসের মর্ম বিভিন্ন হওয়ার কারণে। অর্থাৎ একজন আলিম একটি হাদিসকে নিজের মতামতের দলিল বানাতেন। আবার অন্য আলিম একই ক্ষেত্রে অন্য কোনো হাদিস গ্রহণ করতেন। সব ধরনের মতবিরোধ সাহাবিদের যুগ থেকেই চলে আসছিল। আর একে বলা হয়েছে মুসলমানদের জন্য রহমত। মুসলমানরা একে রহমতই মনে করতেন। একজন অন্যজনের আমলকে বাধা দিতেন না এবং ভিন্ন আমলকারীদের গুনাহগারও মনে করতেন না ।কখনো কখনো একই হাদিস থেকে দুই রকম অর্থ বোঝার কারণে মতভেদ তৈরি হতো। একজন আলিম ওই হাদিস থেকে এক অর্থ গ্রহণ করতেন, আবার অন্যজন গ্রহণ করতে আরেক অর্থ। এভাবে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া প্রকাশ পেত। এই মতবিরোধও প্রথম প্রকারের মতবিরোধের মতো মুসলমানদের জন্য রহমত ছিল।কখনো কখনো মতবিরোধের কারণ হতো–এক আলিমের কাছে এক হাদিস পৌঁছেছে, আর তিনি ওই হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। আবার অন্য আলিমের কাছে ওই হাদিস পৌঁছেনি। ফলে তিনি নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। এই মতবিরোধও মুসলমানদের জন্য ছিল রহমত; ক্ষতির কারণ ছিল না। কারণ, যে ব্যক্তি হাদিস না পাওয়ার কারণে নিজের মত অনুযায়ী অথবা কিয়াস থেকে কোনো ফতোয়া দিতেন, তিনি সাথে সাথে[১৫] এই কোনো মসিবতের মুখোমুখি হতে হতো না। একেবারে স্বচ্ছ-সরল ইসলামের অনুসারী ছিল তারা।উল্লিখিত নতুন ফেরকাগুলো ছিল দুনিয়াপূজারি লোকদের চেষ্টা ও ক্ষমতা লাভ করার খাহেশ থেকে সৃষ্ট। তাদের কাজকর্মগুলো বেশি তৈরি হতো ইরাক ও ইরানের অঞ্চলগুলোতে। ইসলাম থেকে তাদের খারিজ ও পথভ্রষ্ট মনে করা হতো। আলিমরা যতদূর সুযোগ পেতেন, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদেরভ্রান্তি তুলে ধরতেন।এই ফেরকাগুলো তৈরি করা হয়েছিল যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে। আর তৈরি হয়েই তারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে যেত। তাই তাদের সংশোধন হতো তরবারির মাধ্যমেই। লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার আগে তাদের আকিদা রহস্যেঘেরা অর্থাৎ গোপন থাকত। সেগুলোকে তারা প্রকাশ্যে নিয়ে আসত না। ফলে জবাব দেওয়া জন্য তাদের আকিদাগুলো নিয়ে ইলমি আলোচনার সুযোগ কমই পাওয়া যেত।১৪০ থেকে ১৪৩ হিজরি পর্যন্ত কিছু মনীষী হাদিসের কিতাব সংকলন শুরু করেন। তাদের মধ্যে ইবনে জুরাইজ মক্কায়, ইমাম মালেক (রহ.) মদিনায়, আওজায়ি শামে, ইবনে আবু আরুবা ও হাম্মাদ ইবনে সালামা (রহ.) বসরায় এবং মুহাম্মাদ ইয়েমেনে সুফিয়ান সাওরি (রহ.) কাজ করছিলেন কুফায়। এ ছাড়াও ইবনে ইসহাক মাগাজি এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কুফায় ফিকহসংকলন করেন।এই যুগেই মনসুর আব্বসি বাগদাদে বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে গ্রন্থ সংকলন করেন। এ ছাড়া তিনি একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জোরদার করেন লেখালিখি চর্চা। বিভিন্ন ভাষার কিতাবাদি আরবিতে অনুবাদ শুরু করেন। মনসুর আব্বাসির কাতেবের নাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুকনি। তিনি একজন মাজুসি ছিলেন। অবশ্য পরে মুসলমান হয়েছিলেন এই মুকনি। খলিফা মনসুরের নির্দেশে তিনি অ্যারিস্টটলের কয়েকটি পুস্তিকা আরবিতে অনুবাদ করেন। ফারসি ভাষা থেকেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করেন আরবি সাহিত্যে সংযোজন করেন। কালিলা ওয়া দিমনা কিতাবটিও তিনিই সর্বপ্রথম আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন।১৪৫ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনুল মুকনি নিহত হন। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম ফাজারি খলিফা মনসুরের নির্দেশে একটি হিন্দি গ্রন্থ আরবিতে

অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থ ইলমুল হাইয়াহ[১৬] সম্পর্কে লেখা ছিল। পরে এর নাম রাখা হয়[আস সানাদুল হিনদুল কাবির। মুসা ইবনে মুসা ফাজারিও কয়েকটি গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন। আবু মুসা জাবের ইবনে হাইয়ান হাররানি নিজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আসরারুল কিমিয়া ও ইলমুল হাইয়াহ-এর ওপর কয়েকটি কিতাব লেখেন। এই আবু মুসা ইন্তেকাল করেন ১৬১ হিজরিতে।প্রথম শতকে তৈরি হওয়া ফেরকাগুলোর মধ্যে একটি ফেরকার উৎপত্তি হয়েছিল। কুফায়। মুখতার আকিদা বিশ্বাসে হুলুল বা অবতারের ধারণাও ছিল। তারপর মুখতার নিজের সম্পর্কে এই দাবিও করেছিল, স্বয়ং খোদা তায়ালা তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, তার এই বেহুদা কথা বেশির ভাগমানুষ মেনেও নিয়েছিল।মুখতার নিহত হওয়ার পর এই সমস্ত মানুষদের বেশির ভাগ তাওবা করে। কিন্তু মানুষের খোদা হওয়ার মাসয়ালা সাধারণ মজলিস ও জনসমাগমে ব্যাপকভাবে ঠাট্টার ছলে চলতে থাকে। ফলে কিছু সময় বিতর্কের সুরতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা রয়েই গেল। তাওবাকারীরাও নিজেদের কৃত ভুলকে হালকা করার চেষ্টা করে। এরই অংশ হিসেবে তারা আল্লাহর গুণাবলির বিভিন্ন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাহাজির করা শুরু করে।উমাইয়া আমলেই গ্রিক দর্শনের কিছু গ্রন্থ অনুবাদ করা শুরু হয়েছিল। তাই পদার্থ ও আরজ বা অবস্তু[১৭] ইত্যাদি দার্শনিক পরিভাষাগুলোকে আল্লাহ তায়ালার সত্তা এবং আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে ব্যবহার করা শুরু করে মানুষ।ওই দার্শনিক পরিভাষার ব্যবহার এবং আলোচনায় দার্শনিক যুক্তি দেওয়ার ধারা দ্বীনি মজলিসগুলোকে খুব দ্রুত প্রভাবিত করতে শুরু করল। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হলো। এই যুগের উলামায়ে কেরামের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন তাবে-তাবেয়ি। তাঁরা এই কাণ্ডকে ভয়াবহ ফিতনা আখ্যা দিয়ে তা দমন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যে জিনিস কুদরতিভাবে নিজে নিজেই তৈরি হয়, তা কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। ফলে একটি দল তৈরি হলো। আর এই দলটিই পরবর্তী সময়ে মুতাজিলা নামে প্রসিদ্ধ হয়।এমন একটি দল তৈরি হলো, যারা কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং দুনিয়াবি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নয়; বরং দর্শনকে প্রচার এবং ইলমি আলোচনার পরিণতিতে[তৈরি হয়েছিল। এই দলের সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন আমর ইবনে ওবায়েদ, যিনি ১৪৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হকপন্থি উলামায়ে কেরাম এই দলটিকে বিদআতি বলতেন। আর তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। অন্যদেরও তাদের বক্তব্য ও কথা শুনতে নিষেধ করতেন। তারপরও যখন সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত হতে দেখতেন, তখন উলামায়ে কেরাম আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করতেন। এই আলোচনাগুলোতে তারা কুরআনের আয়াতের সাহায্য নিতেন।গ্রিক, ফারসি ও হিন্দি কিতাবগুলোর অনুবাদ, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্রগুলোর প্রসার করে। আর সিরাত ও মাগাজি ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর কিতাব রচিত হওয়ায় উলামায়ে কেরামকে একটি বিশেষ দিকে মনোযোগী করেছে। তা হলো–তারাও হাদিসগুলোকে কোনো কিতাবে সংকলন করবেন।আর তারা হুকুক ও ফরায়েজ সম্পর্কিত মাসয়ালাগুলো ধারাবাহিক গ্রন্থ লিখবেন।মোটকথা, আব্বাসি খিলাফতের সূচনালগ্ন থেকেই মুসলমানদের মধ্যে গ্রন্থ লেখা ও সংকলনের ধারা জোরেশোরে চালু হয়। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, মানতেক, নাহু, দর্শন, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, জীবনী, ইতিহাস ইত্যাদির ওপর গ্রন্থ লেখাশুরু হলো।একসময় মুতাজিলারা দর্শনের পরিভাষা ব্যবহার করা শুরু করল। এরপর খুব দ্রুত গ্রিক দর্শন, নিজেদের মূলনীতি ও পরিভাষাগুলো নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। তখন উলামায়ে কেরাম দর্শনের পরিভাষা ও যুক্তির সিঁড়ি সাজিয়েই ইসলামের সত্যতাকে প্রমাণ করলেন। শত্রুর অস্ত্র দিয়েই শত্রুকেই পরাজিত ও লাঞ্ছিত করলেন। দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার পরিভাষা ও যুক্তি দিয়ে ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত করার নামই ইলমে কালাম।কুরআনের আয়াত এবং নবি (সা.)-এর কথার উদ্দেশ্য ও মর্ম বুঝতে কুরাইশি ভাষার ব্যবহার এবং আরবির দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি ছিল। সুতরাং আরবি ভাষার ব্যাকরণ, সরফ, নাহু ইত্যাদি শাস্ত্রের রূপ পেল। সহিহ হাদিসগুলোকে বানোয়াট ও জাল হাদিসগুলো থেকে আলাদা করতে কিছু কায়েদা ও উসুল নির্ধারণ করার জরুরি হয়ে ওঠে। তাই উসুলে হাদিসকে আসমাউর রিজাল ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রের রূপ দেওয়া হলো।ইসলামি সাম্রাজ্য তথা আব্বাসীয় খিলাফতের সীমানা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিরাট এই সাম্রাজ্যের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে রাস্তা ও সড়ক তৈরি ছাড়াও মানচিত্রের ওপর গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন দেখা দিলো । আর তাই মুসলমানরা ভূগোলের গ্রন্থ ও সফরনামা লেখা শুরু করে দিলেন। মোটকথা, এই শতকে মুসলমানরা অনেক জ্ঞান ও শাস্ত্রের জন্ম দিলো। আর রচনা করল বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ। বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে নতুন সংস্কৃতি এবং নতুন সামাজিক

রীতিনীতি সংযোজন হলো। ফলে নতুন নতুন প্রয়োজনও সৃষ্টি হলো। এসব নতুন নতুন বিষয়ের মোকাবিলায় বিভিন্ন গ্রন্থ ও শাস্ত্র রচনার প্রয়োজন পড়ল। এসব অবস্থা ও পরিবর্তনের মধ্যেই আরও বেশি প্রতিষ্ঠিত হলো কুরআন ও সুন্নাহর আবেদন।এর সাথে সাথে উল্লিখিত ফেরকা ও দলগুলোলা আরও বেশি সুযোগ পেল। এই দলগুলোর ভিত্তি ছিল শুধু ব্যক্তিস্বার্থ ও দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণ। আর কিছু দল তৈরি হয়েছিল মূর্খ নওমুসলিম মাজুসি ও হাঙ্গামাপ্রিয় মানুষদের নিয়ে। তারা জ্ঞানগত উন্নতি করল। একই সাথে দর্শন ও মানতেক ইত্যাদির প্রচার-প্রসারকে কাজে লাগাল। তাদের চেষ্টা ছিল যুক্তির পোশাক পরিয়ে কুফরি ও শিরকি আকিদাকে চাকচিক্য করে তোলা। এই পোশাক বন্য গোঁয়ার ও মূর্খদের জন্য তৈরি হয়েছিল। ওই গোঁয়ার লোকেরা সাধারণ সংস্কৃতি ও জ্ঞান অর্জন করার পরই ব্যবহার করতে পারবে যুক্তির পোশাকটি। আর এর ধোঁকা থেকে বের হওয়া ছিল বেশ কঠিন।দুনিয়া কখনো মূর্খ ও আহামকমুক্ত ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। তাই বেশির ভাগ জ্ঞান ও শাস্ত্রের উৎপত্তির সেই যুগেও নতুন নতুন ভ্রান্ত ফেরকা গড়ে উঠল। শুধু তা-ই নয়, তা ডালপালাও বিস্তার করল।আলিমদের মধ্যে মুতাজিলাদের বিভিন্ন মতামতের চর্চা ছিল। তাই অধিকাংশ শিয়া ফেরকাগুলো এর ফায়দা নেওয়ার ফন্দি করল। তারা কিছু আলিমকে চিহ্নিত করে খারেজি বলে প্রচার শুরু করল। উল্লেখ্য এই সমস্ত আলিম নেক নিয়তের সাথে কিছু মাসয়ালা অথবা কিছু আকাইদে অন্যদের সাথে মতবিরোধ রাখত। অথচ খারেজি ছিল মূলত সাবায়ি মানুষজন; আর ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কও ছিল না। তারা বরং অতি সূক্ষ্মভাবে ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করত। কিন্তু দ্বিতীয় শতকে এসে খারেজি শব্দের অর্থ পালটে যায়। তাদের ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর একটি বলে গণ্য করা হয়।মক্কা, মদিনা ও হেজাজে হাদিস জানা মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক একটু বেশিই ছিল। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম সাধারণত এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাই হেজাজবাসীর খুব একটা ইজতিহাদ ও কিয়াসের প্রয়োজন পড়ত না। বিপরীতে কুফা, বাগদাদ ও ইরাক অঞ্চলের অধিবাসীদের ইজতিহাদি রায় এবং কিয়াস করে কাজ করতে হয়েছে বেশি। কারণ, সেখানে হাদিসের জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ছিল কম। আর সেইসব অঞ্চলে সাহাবিদের বসবাসও ছিল অনেক কম।

ইরাকি উলামায়ে

এই কারণেই হেজাজি উলামায়ে কেরামকে আহলে হাদিস এবং আহলে রেওয়ায়াত অর্থাৎ বর্ণনার অথরিটি বলা হতে থাকে। আর ইরাকি উলামায়ে কেরামকে মুজতাহিদ ও আসহাবুর রায় বলা হয়। আহলে হাদিস ও আসহাবুর রেওয়ায়াত অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইমাম মালেক (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত মনে হতো। মুজতাহিদ ও আহলুর রায় মনে করা হতো ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ১৫০ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ছিলেন খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁদের দুজনকে সাহেবাইন নামে স্মরণ করা হতো। সাহেবাইন নিজেদের শিক্ষক অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথেও ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ইমামের ইজতিহাদি ফতোয়া এবং তাঁর রায় ও কিয়াস থেকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মাসয়ালার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। কিন্তু এ থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মর্যাদা একটুও কমেনি।উল্লেখ্য, মুজতাহিদ কখনো ভুল করেন, কখনো সঠিক মত দেন। আর তাঁর নিয়ত নেক হওয়ার কারণে ভুল হলেও তিনি সওয়াব পান ।সুফিয়ান সাওরি (রহ.) ১৬১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ১৬৫ হিজরিতে ওফাত পান দাউদ তাঈ (রহ.); যিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শাগরেদ ছিলেন। ১৭০ হিজরিতে আবু আবদুর রহমান খালিল ইবনে আহমাদ আজদি ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন ইলমে নাহু, লুগাতের ইমাম এবং কাব্যবিদ্যা প্রবর্তক।ইমাম মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ১৭৯ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাব মুআত্তা তাঁরই স্মৃতিচিহ্ন। এই কিতাবের বিন্যাস ও পরিমার্জনে তিনি সারাজীবন ব্যস্ত ছিলেন।১৭৩ হিজরিতে হারুনুর রশিদ মদিনা মুনাওয়ারায় যান। সেখানে ইমাম মালেক (রহ.) থেকে মুআত্তা শুনে তাঁকে ৩০০০ আশরাফি হাদিয়া দেন। তিনি তাঁকে বলেন–'আমার সাথে বাগদাদে চলুন। উসমান (রা.) যেভাবে মুসলমানদের কুরআন মাজিদের ব্যাপারে একত্রিত করেছেন, একইভাবে আমি এই মুআত্তার ওপর সব মুসলমানকে একত্রিত করব।ইমাম মালেক (রহ.) উত্তর দিলেন–'আপনার চিন্তা পুরোপুরি ভুল। কেননা, রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর সাহাবিরা বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই প্রত্যেক অঞ্চল ও শহরের মানুষ নিজের কাছে ইলম রাখে। আর রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের

মতবিরোধ রহমত। তাই আপনি আপনার এই ইচ্ছা থেকে বিরত থাকুন।'সুতরাং ইমাম মালেক (রহ.) মদিনার বাইরে গেলেন না। অন্যদিকে হারুনুর রশিদও নিজের ইচ্ছা পূরণ করা থেকে বিরত থাকলেন। ১৮৭ হিজরিতে বাগদাদে যান ইমাম মালেক (রহ.)-এর ছাত্র ইমাম শাফেয়ি। এক মাস সেখানে অবস্থান করার পর মিশরে চলে যান তিনি। সেখানে থাকা অবস্থায় ২০৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। খলিফা হারুনুর রশিদ ১৭৪ হিজরিতে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম ইবনে হাবিবকে বাগদাদের বিচারপতি নিযুক্ত করেন। তার পিতা আবু ইউসুফ ছিলেন ইমাম আবু হানিফার ছাত্র । ১৮০ হিজরিতে খলিফা তার শাসনাব্যস্থায় প্রধান বিচারপতি পদ সৃষ্টি উক্ত পদে অভিষিক্ত করেন ইমাম আবু ইউসুফকে। উল্লেখ্য, তখন তিনি বসরার বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ ২৮২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তখন তার জায়গায় তার ছেলে ইমাম ইউসুফকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যিনি বাগদাদের বিচারপতিরদায়িত্ব পালন করছিলেন।প্রথমত আকিদাগত কিছু ভিন্নমতের মুসলমানের মধ্যে মুতাজিলাদের অভ্যন্তরীণ একটি ফেরকা সৃষ্টি হয়েছিল। এখন এই মতবিরোধের বেশ জোরেশোরেই ডালপালা মেলতে শুরু করল। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হতে লাগল। হাদিস ও কাদিমের১৮ আলোচনা শুরু হলো। আল্লাহর কালাম সম্পর্কে বিমূর্ত ও শব্দহীন ভাষা (কালামে নফসি) ও শব্দনির্ভর ভাষা (কালামে লফজি) নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো। বেশ কিছু বিষয়ে তর্কবিতর্ক সৃষ্টি হলো। শত শত মাসয়ালা এলো। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—মানুষ নিজের কাজের স্রষ্টা নাকি পুতুল, মানুষের ইতিবাচক ও নেতিবাচক গুণাবলি, আল্লাহর দিদার, ফেরেশতা, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কুরসি, মুজিজাত, ইসমতে আম্বিয়া, ওহি, নবুয়ত, মিরাজ, আল্লাহ তায়ালার কালাম মাখলুক নাকি গায়রে মাখলুক ইত্যাদি।এসব বিষয়ের প্রত্যেকটি প্রমাণিত বা প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে সামনে এলো কালামশাস্ত্র৯, দর্শন-ফিলোসোফি-মানতেকের হাজারো পরিভাষা। উলামায়ে কেরামের মুখে মুখে এসব প্রচলিত হয়ে গেল। অথচ সাহাবি ও তাবেয়িগণ এসবের কোনো প্রয়োজন অনুভব করেনি। তাঁদের কাছে ইসলাম ছিল সহজ- সরল এক জীবনবিধান।আগে আলিম হওয়ার জন্য নবিজির হাদিস এবং বর্ণনাকারীদের নাম মনে রাখা জরুরি ছিল। এই সময়ে এসে আলিম হওয়ার জন্য হাজারো নতুন পরিভাষা মনে১৮ কদিম অর্থ অবিনশ্বর, হাদিস অর্থ নশ্বর (যার আগে অস্তিত্ব ছিল না)।১৯ ইসলামি আকিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাসবিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় 'ইলমুল কালাম'।রাখা এবং উল্লিখিত মাসয়ালাগুলোর ওপর আলোচনা করতে পারার যোগ্যতাও জরুরি হয়ে গিয়েছিল। এই গায়রে শরয়ি বিষয়গুলো যত বেশি লাগল, ততই লোকেরা কুরআন-হাদিস থেকে দূরে সরে যেতে থাকল। কুরআন-হাদিস গবেষণা করা এবং আখলাক ও আধ্যাত্মিকতার দিকে মনোযোগদেওয়ার যেন কোনো জো নেই কারও।গুরুত্ব পেতেহারুনুর রশিদ প্রধান বিচারপতি পদটি সৃষ্টি করলেন এবং ইমাম আবু ইউসুফকে প্রধান বিচারপতি বানালেন। তাকে সব অঞ্চল ও শহরে নিজের ইচ্ছায় বিচারপতি নিয়োগ দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হলো। ফলে তিনি এমন লোকদের বিচারক বানিয়ে সব শহর ও অঞ্চলে পাঠালেন, যারা তার ও তার ওস্তাদের অনুসারী। এ ছাড়াও গণ অধিকার ও আল্লাহর ইবাদতভুক্ত ফরজ মাসয়ালাগুলোতেতাদের সমমতাবলম্বী।নবনিযুক্ত এই বিচারকগণ শহর ও অঞ্চলগুলো গিয়ে দেখলেন, সেখানে ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরি (রহ.) প্রমুখের ফতোয়া প্রচলিত। তখন ওই বিচারপতিদের ফয়সালা ওই এলাকার লোকদের কাছে বিস্ময়কর মনে হলো। এভাবেই আমল, ইবাদত, হুকুক, ফারায়েজ ইত্যাদি মাসয়ালাগত মতবিরোধ ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলির রূপ ধারণ করল।এ তো গেল আকাইদসংক্রান্ত মতবিরোধের আলোচনা। এখন আমল ও ফিকহি মাসয়ালা নিয়ে বহু দল-উপদল সৃষ্টি হতে লাগল। অথচ এর আগে এসব মতবিরোধ এত গুরুত্ব বহন করত না। মানুষ ইসলামের রুখসত ও সহজতার দ্বারা খুবই খুশি ছিল। এই বিচারপতিদের মাধ্যমে একটি বিশেষ মাজহাবের প্রচলন ঘটতে থাকল। গুরুত্ব পেতে শুরু করল ছোটোখাটো মতবিরোধসমূহ।আব্বাসি খিলাফতের পর কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্রগণ। ফলে হানাফি ফিকহ প্রসারে একটি শক্তিশালী ক্ষেত্র তৈরি হলো। আর এভাবেই আব্বাসি খিলাফতের প্রদেশ ও শহরগুলোতে হানাফি ফিকহ ও ফতোয়ার ব্যাপক প্রচলন হলো।তখনও কেউ ভাবতে পারেনি, ভবিষ্যতে এই ফিকহ ইখতিলাফের কারণে চারটি ভিন্ন ভিন্ন মাজহাব গড়ে উঠবে। আবার এই চার মাজহাবের যেকোনো একটির তাকলিদ অনুসরণকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হবে।গ্রিক দর্শনের গ্রন্থগুলোর অনুবাদ এবং ইলমে কালামের উৎপত্তি থেকেই মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ সূচিত হয়। মামুনুর রশিদ সবচেয়ে

বেশি গ্রিক দর্শনের অনুবাদ করান। বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের গ্রন্থগুলো। তিনি বাইতুল হিকমাহ অথবা দারুত তরজমাকে প্রণোদনা দেন। ফলে খ্রিষ্টান মাজুসি এবংইহুদি আলিমদের বেশির ভাগই বাগদাদে জড়ো হলেন। তারা ব্যস্ত হলেনঅনুবাদের কাজে।শাসকদের উৎসাহ উলামায়ে কেরামকে এই শাস্ত্রগুলোর দিকে মনোযোগী কুরআন-হাদিস থাকতে অন্য কোনো ইলমের প্রয়োজন ছিল না। এসব প্রাচীন দর্শন এবং বিচ্ছিন্ন জ্ঞানগুলোর দিকে মনোযোগী হয়ে আলিমগণ সবগুলোকে সুসজ্জিত ও সংকলন করল। যেন এসব আগে কখনো ছিল না ও নতুনভাবে প্রবর্তিত হয়েছে। অনুবাদের স্বাধীনতাই ফলে বিভিন্ন জাতির দর্শনকে কুরআনি দর্শনের মুখোমুখি করল। এসব নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্র সৃষ্টি হলো। এই অবস্থা দেখে ইসলামের খাদেমরাও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারা ওইসব দর্শন ও কুরআনবিরোধী নীতিকে ভুল, বেঠিক প্রমাণিত করতে সফল হলেন। এভাবে ধর্ম ও জ্ঞানের সাথে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা জারি হয়ে ইসলামের ইলমি বিজয় হাসিল হলো। এই বিজয় ছিল রাজ্য বিজয়ের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দের ও মর্যাদার। আর এই জ্ঞানগত বিজয়ই আব্বাসি খিলাফতকে উমাইয়া খিলাফতের সমান উচ্চতায় পৌছে দিলো। অন্যথায় রাজ্য বিজয়ের হিসেবে উমাইয়া খিলাফতের আব্বাসি খিলাফতের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। আর আব্বাসিরা তো উমাইয়াদের বিজয় করা কয়েকটি অঞ্চল শেষ পর্যন্ত নিজেদের দখলেও রাখতে পারেনি।মুতাজিলা দলের বিচারপতি ইহইয়া ইবনে আকসাম বড়ো মর্যাদার একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মামুনুর রশিদ আব্বাসির সহচর ছিলেন এবং প্রায় প্রধানমন্ত্রীর মতো প্রভাব ও ক্ষমতা রাখতেন। তার কারণে মুসলমান আলিমদের ইলমি আলোচনায় আল্লাহর গুণাবলির ওপর বেশির ভাগ আলোচনা-সমালোচনাহতো তখন।এই ধারাবাহিকতায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, কুরআন মাজিদ মাখলুক নাকি গায়রে মাখুলক? এই আলোচনা এত দীর্ঘ হলো, যার কারণে খলিফা মামুনুর রশিদের হাতে বড়ো বড়ো মর্যাদাবান আলিমরা পর্যন্ত নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। খালকে কুরআনের এসব মাসয়ালা ছিল অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন। তথাপি কাজি ইয়াহিয়ার শাগরেদ আহমাদ ইবনে আবু দাউদ এবং অন্য সভাসদরা মুতাসিম বিল্লাহ আব্বাসিকে বেশি মনোযোগী করে তোলে। ফলশ্রুতিতে খলিফা মামুনুর রশিদের হাতে পেরেশান ও নির্যাতিত হলেন অনেক হক্কানি আলিম। একই অবস্থাই ছিল ওয়াসিক বিল্লাহ আব্বাসিরও।প্রত্যেক যুগেই দুনিয়াবি স্বার্থবিমুখ কিছু মানুষ থাকেন। ওই যুগেও প্রত্যেক শহরে ও এলাকায় এমন কিছু মানুষ ছিলেন। তাদের বলা হতো নির্লোভ ওদুনিয়াবিমুখ ইবাদতগুজার সাধক। কারণ, তারা নিজের পুরো জীবন ইবাদত ও নির্জনবাসের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। অন্যথায় তো প্রত্যেক কাজই, যেমন : ব্যবসা, কৃষি, হাতের সানআত, সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই দ্বিতীয় শতকে নির্জনবাস অবলম্বনকারীদের আস্তানা ও খানকাও মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে ওঠে। মানুষজন নির্জনবাসী দুনিয়াবিমুখ সাধকের সাথে সম্পর্ক রাখত। সে সময় বিভিন্ন ধরনের বাইয়াত, যেমন : বাইয়াতে ইরশাদ হিসেবে গ্রহণ এবং বাইয়াতে তাওবা করার প্রচলন শুরু হয়।২০ কিন্তু সুফিবাদের সিলসিলার প্রচলন তখনও হয়নি। এই যুগকেও ইসলামের উত্তম,উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগ মনে করা হয়।

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন

দুটি যুগের মধ্যে পার্থক্য রেখা :

জনৈক সাহিত্যিক বলেন,দু'টি ক্ষেত্রে নিখু৭ত সূচনাকালে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; ব্যক্তিজীবনে নিদ্রা এবং জাতীয় জীবনে অধঃপতন। আসলেও তাই। কোন জাগ্রত ব্যক্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে একথা বলা সম্ভব নয় যে, ঠিক কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তদ্রুপ কোন জাতি সম্পর্কেও একথা বলা সম্ভব নয় যে, ঠিক কোন সময়টাতে জাতির অধঃপতন শুরু হয়েছে। বস্তুত এ দুটি বিষয় তখনই পূর্ণ উপরব্ধিতে আসে যখন তা ভালোভাবে জেকেঁ বসে। তবে অধিকাংশ জাতির ইতিহাসে এটা সত্য হলেও মুসলিম উম্মাহর জীবনে অবক্ষয় ও অধঃপতনের সুচনা ছিলো বেশ স্পষ্ট। এমনকি যদি উন্নতি ও অবনতির এই মধ্যবর্তী পার্থক্য-রেখাটির উপর আঙ্গুলিনির্দেশ করতে বলা হয় তাহলে অতি সহজেই আমরা সেই ঐতিহাসিক রেখাটি চিনহিত করতে পারবো যা খিলাফতে রাশেদা ও আরব মুসলিম শাসনকে পৃথক করে রেখেছে।

আমরা যদি এক নজরে মুসলিম উম্মাহর উত্থানের কারণসমূহ পর্যালোচনা করতে চাইতাহলে দেখতে পাবো যে, সূচনাকালে প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম শাসন এবং পরোক্ষভাবে বিশ্বশাসনের দায়িত্বভার এমন একদল মানুষের হাতে ছিলো যারা প্রত্যেক ঈমান ও বিশ্বাস, জীবন ও চরিত্র, নীতি ও নৈতিকতা,মহত্ব ও মহানুভবতা, আত্বশুদ্ধি ও আধ্যাত্বিকতা এবং পূর্ণতা ও ভারসাম্যপূর্ণতার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ সা. এর জীবন্ত মু'জিয়া ছিলেন। ইসলামের ছাচেঁ তাঁদের তিনি এমন পরিপূর্ণরূপে গড়ে তুলেছিলেন যে, দেহসত্তা ছাড়া অন্যকোন ক্ষেত্রে অতীতের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিলো না;না চিন্তা-চেতনায়,না ভাবে ও স্ববাবে এবং না চাওয়া ও চাহিদার ক্ষেত্রে। সূক্ষ্ম বিচারকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেওতাঁদের জীবণ ও চরিত্রে ইসলামের প্রাণ ও চেতনার পরিপন্থী জাহিলিয়াতের সামান্য কোন চিনহও খুঁজে পাওয়া যেত না। বরং র্নিদ্বিধায় বলা যায়, ইসলামকে মানবরূপে উপস্থিত করা হলে তা হুবুহু তাঁদেরই যে কোন একজনের মতোই হতো। আগেও যেমন বলেছি,তাঁরা ছিলেন দ্বীন ও দুনিয়ার সুসমন্বয়ের যিন্দা নমুনা ও আদর্শ উদাহরণ।

একদিকে তাঁরা ছিলেন মসজিদের মাননীয় ইমাম, অন্যদিকে আদালতের মহামান্য বিচারক। মসজিদে তাঁরা দ্বীন ও ইলম শিক্ষা দিতেন এবং আদালতে বিচারকের আসনে ইনছাফ কায়েম করতেন। একদিকে তাঁরা ছিলেন বাইতুল মালের আমানতদার ও পাহারাদার, অন্যদিকে রণাঙ্গনের যোগ্য সেনাপতি ও কুশলী যুদ্ধ পরিচালক। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে যেমন তাঁদের কোন তুলনা ছিলো না, তেমনি ইকামাতে দ্বীন ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায়ও তাঁরা ছিলেন তুলনাহীন।

এককথায় তাদেঁর প্রত্যেকে একই সঙ্গে ছিলেন মুত্তাকী, পরহেযগার ও আল্লাহ-ভীরু ধার্মিক এবং সাহসী মুজাহিদ, ফকীহ মুজতাহিদ, বিজ্ঞ বিচারক,সুদক্ষ শাসক ও কুশলী রাজনীতিক। তাঁদের একই ব্যক্তি ছিলেন দ্বীন ও দুনিয়া এবং ধর্ম ও রাজনীতির ধারক, আর তিনি হলেন খলীফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীন। তাঁর চারপাশে ছিলো এমন এক জামা'আত, যারা মসজিদে নববীতে এবং শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা অর্জন করে অভিন্ন ছাচেঁ গড়ে উঠেছেন। তাঁরা অভিন্ন চিন্তা-চেতনা এবং আত্মা ও আত্মিকতার অধিকারী ছিলেন।তাঁদের শিক্ষা.দীক্ষা ও তারবিয়াত ছিলো এক ও অভিন্ন। শাসনকার্যে ও অন্যান্য বিষয়ে খলীফা তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের সাহায্য নিতেন।তাঁদের উপস্থিতি ও পরামর্শ ছাড়া উম্মাহর কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহন করতেন না। ফলে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ও প্রান চেতনাসমাজে ও প্রশাসনে এবং মানুষের জীবণ ও চরিত্রে গভীরভাবে প্রতিফলিত হতো এবং তাঁদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা প্রবণতা সর্বত্র পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হতো। তাই মানুষের আত্বা ও জড়সত্তা, ইহজীবন ও পরজীবন এবং ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিলো না। তদ্রুপ নীতি ও প্রবৃত্তি এবং উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার মধ্যে ছিলো না কোন রেষারেষি; এমনকি বিভিন্ন সমাজশ্রেণীর মধ্যেও ছিলো না কোন সর্জ্ঘষ।

এককথায় ইসলামী সালতানাত ও মুসলিম সমাজ ছিলো তার পরোধাপুরুষদের আখলাক ও চরিত্র,স্বভাব ও বৈশেষ্ট্য এবং পূর্ণতা ও ভারসাম্যপূর্ণতার আদর্শ প্রতিচ্ছবি।

পারস্যের সম্রাটপূজা :

কিসরা (খসরু) উপধিধারী পারস্যের সম্রাটগণ ভাবতেন, পৃথিবীতে তারা ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। তাদের ধমনীতে ঐশী রক্ত প্রবাহিত এবং বর্ণ নীল। প্রজারাও সম্রাট ও রাজ পরিবারকে সে দৃষ্টিতেই দেখতো এবং বিশ্বাস করতো, রাজবংশের স্বভাব-প্রকৃতিতে ঊর্ধজাগতিক পবিত্র কোন উপাদান রয়েছে। তাই তারা তাদের সিজদা-প্রণাম করতো এবং তাদের ঈশ্বরত্বের বন্দনা গাইত। সম্রাট ছিলেন আইন ও সমালচনার, এমনকি মানবতারও ঊর্ধে। তাই সম্রাটের 'পবিত্র' নাম তারা মুখে উচ্চারণ করতো না এবং রাজসভায় উপবেশনের সাহস করতো না। প্রজাদের আরো বিশ্বাস ছিলো , প্রতিটি মানুষের উপর সম্রাটের অধিকার রয়েছে, কিন্ত সম্রাটের উপর কারো কোন অধিকার নেই। সম্রাট যদি কাউকে কিছু দান করেন, কিংবা ভোজপাত্র থেকে কোন টুকরো ছুঁড়ে দেন তবে সেটা শুধুই করুণা, অধিকার ও প্রাপ্য কিছুতেই নয়। সম্রাটের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যই হলো প্রজা-কর্তব্য এবং মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। রাজবংশের দাসত্বেই প্রজাবংশের গৌরব।

রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের জন্য একটি বিশেষ পরিবার তথ্য কায়ানী পরিবার নির্ধারিত ছিলো। পারস্যবাসী মনে করতো, রাজমুকুট ধারণ ও সিংহাসনে আরোহণ, এটা তাদরে একক অধিকার এবং রাজ্য ও রাজভান্ডারের তারাই একমাত্র হকদার, যা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা থেকে পুত্রে হস্তান্তরিত হবে, হতেই থাকবে। তাতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার সাম্রাজ্যের আর কারো নেই। এ অধিকার এমনই মৌরুসি ছিলো এবং প্রজাদের বোধ,বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এমনই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলো যে, তাতে সামান্য ব্যত্যয় ঘটাবার সাধ্য ছিলো না কারো। এমনকি প্রাপ্ত বয়স্ক উত্তরাধিকারী না পাওয়া গেলে সম্রাটের শিশু পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হতো। পক্ষান্তরে পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলে কোন নারীকেই প্রজারা সম্রাজ্ঞীরূপে বরণ করে নিতো, যাতে শাসনদন্ড রাজ পরিবারেই সংরক্ষিত থাকে। যেমন সম্রাট শেরোবার মৃত্যুর পর সাত বছরের পুত্র আর্দেশীরকে সিংহাসনে বসানো হয়। একইভাবে কিসরা পারভেজের শিশুপুত্র ফররূখযাদ খসরু সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যদিকে কিসরার দুই কন্যা বোরান ও আযরামিদখত একই সূত্রে সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু এত বড় জাতীয় সংকটকালেও কারো কল্পনায়ও আসেনি যে,যোগ্য,বিজ্ঞও প্রভাবশালী কোন সেনাপতি বা সভাসদকে, যেমন ছিলেন রুস্তম, জাভান ও অন্যান্য, তাদের কাউকে রাজ্যশাসনের ভার দেয়া যেতে পারে। কেননা হয়ত তাদের সবকিছু ছিলো, কিন্তু তাদের ধমনীতে ছিলো না রাজবংশের নীল রক্ত।

ভারতবর্ষঃ ধর্ম,সমাজ ও নৈতিকতার বিচারে :

ভারতবর্ষের ইতিহাস যারা লিখেছেন তারা এ বিষয়ে পূর্ণ এক মত যে, খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়া থেকে যে সময়কালের শুরু সেটাই ছিলো ধর্ম,সমাজ ও নৈতিকতার দিক থেকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে অধঃপতিত যুগ, যা ইতিহাসের কোন স্তরে জ্ঞান ও সভ্যতা,নীতি ও নৈতিকতা এবং নানা সংস্কার-আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিলো। অধঃপতন ও সামাজিক অবক্ষয়, যা তখন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলোছিলো, সে ক্ষেতে বিশাল ভারতবর্ষও চারপাশের অন্যান্য দেম,জাতি ও জনগোষ্ঠীর সহযাত্রী ছিলো এবং এগিয়ে না থাকলেও কারো থেকে পিছিয়ে ছিলো না কোনো ক্ষেত্রেই। সমগ্র মানবজনপদের উপর যে ঘোর অন্ধকার তখন থাবা বিস্তার করেছিলো, ভারতবর্ষ যেন সে অন্ধকারের পর্যাপ্ত অংশই নিজের বরাদ্দে টেনে এনেছিলো। পক্ষান্তরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো পৃতিবরি এ বিশাল ভূখন্ডটি ছিলো একক বেশিষ্ট্যেরদাবীদার। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে আমরা এই তিনটি শিরোনামে তুলে ধরতে পারি-

(ক) উপাস্য দেবদেবীর অকল্পনীয় সংখ্যাধিক্য (খ) লাগামহীন যৌন অরাজকতা (গ) বর্বর ও নিষ্ঠুর জাতিভেদ এবং সামাজিক শ্রেণীভাগ।

মাত্র তেত্রিশ কোটি দেবতা :

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে মূর্তিপূজা ভারতবর্ষে চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। বেদ গ্রন্থে দেবতাদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তেত্রিশ, যার অকল্পনীয় সংখ্যাস্ফিতি এই শতকে পৌছে গিয়েছিলো তেত্রিশ কোটিতে। কল্পনা করুন, তেত্রিশ থেকে তেত্রিশ কোটি! যে কোন সুন্দর, আকর্ষনীয়, অভিনব ও বিদ্ঘুটে বস্তু এবং জীবণের প্রয়োজনীয় যে কোন উপকরণ উপাস্য দেবতার মর্যাদা লাভ করতো। এভাবে মূর্তি ও প্রতিমা এবং দেবী ও দেবতার সংখ্যা সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাদের উপাস্যের তালিকায় যেমন ছিলো বিভিন্ন উদ্ভিদ ও বৃক্ষলতা তেমনি ছিলো অসংখ্য জড়বস্তু ও খনিজ পদার্থ; ছিলো ছোট বড় হাজারো পশু-প্রাণী, এমনকি লিঙ্গপূজা পর্যন্ত বাদ পড়েনি।

পাহাড়-পর্বতও উপাস্যরূপে বরিত হয়েছে এই সুবাদে যে, তাদের কোন কোন দেবতা তাতে অধিষ্ঠান গ্রহন করেছেন। আর গঙ্গা হলো তাদের মা, যা স্নানকারীর সমস্ত পাপ মোচন করে। কারণ গঙ্গা উৎসারিত হয়েছে 'মহাদেব'-এর মাথার জট থেকে।

'গোমাতা'রও তারা পূজা করে, এমনকি গোবর ও গোচনা হচ্ছে তাদের দৃষ্টিতে পরম পবিত্র পদার্থ। এছাড়া তাদের উপাস্যের তালিকায় রয়েছে কতিপয় ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব, হিন্দুবিশ্বাস মতে বিভিন্ন অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় স্বয়ং ভগমান তাদের মাঝে অধিষ্ঠান গ্রহন করেছেন। এভাবে এই সুপ্রাচীন ধর্ম কিছু কল্পকথা, অলীক কাহিনী, আজগুবী চিন্তাবিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার সমাহারেপরিণত হয়েছে, যার স্বপক্ষে না আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন, না কোন যুগের জ্ঞান ও যুক্তি তা সমর্থন করেছে। ডক্তর গোস্তাভ লী বোন 'ভারতবর্ষের সভ্যতা' গ্রন্থে লিখেছেন-

'পৃথিবীর অন্যাত্র জাতির মধ্যে হিন্দু জাতি এদিক থেকে ব্যতিক্রম যে, উপাসনার জন্য তাদের কোনো না কোনো বাহ্যিক আকৃতির উপস্থিতি অপরিহার্য। যদিও বিভিন্ন যুগে ধর্মসংস্কারকগণ হিন্দুধর্মে একত্ববাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা ছিলো নিষ্ফল প্রচেষ্টা। বৈদিক যুগের হিন্দু হোক, কিংবা এ যুগের, তারা প্রকৃতির ছোট বড় সবকিছুরই পূজা করে থাকে। যা কিছু তাদের বুদ্ধির অগম্য এবং যা কিছু তাদের নিয়ন্ত্রণাতীত (এবং যা কিছু কোন না কোনভাবে তাদের আকৃষ্ট করে) সেগুলোই তাদের দৃষ্টিতে উপাসনার উপযুক্ত। হিন্দু ব্রাক্ষন ও দার্মনিকদের এমন সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে যা তারা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করেছেন, এমনকি উপাস্য দেবতার সংখ্যা তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টাও পন্ডুশ্রমে পর্যবসিত হয়েছে। সাধারন মানুষ তাদের শিক্ষা শুনেছে, হয়তো গ্রহনও করেছে,কিন্তু কার্যত এই তিন উপাস্য সংখ্যায় বেড়েই চলেছে এবং প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুতে এ শক্তি তারা কোন না কোন উপাস্যকে দেকতে পেয়েছে।

আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখন মূর্তি ও প্রতিমানির্মাণশিল্প অভাবনীয় উন্নতি লাভ করেছিলো, আর ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে তার চর্মোৎকর্ষ ঘটেছিলো এবং অতীতের যে কোনো সময়কে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। রাজা থেকে প্রজা, সমাজের সর্বস্তরেই ছিলো মূর্তিপূজার অপ্রতিহত প্রভাব, এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও মূর্তিপূজা অস্বীকার করার উপায় খুঁজে পায়নি, বরং ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রচার-প্রসারের স্বার্থে তাদেরও এর আশ্রয় নিতে হয়েছে।

মূর্তিপূজা ও প্রতিমা-শিল্পের প্রভাব ও উৎকর্ষ তখন কোন পর্যায় ছিলো তার কিছুটা ধারনা পাওয়া যায় প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন শাঙ এর বিবরণ থেকে, যিনি ৬৩০ থেকে ৪৪ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছেন। রাজা হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪ খৃ:) যে বিরাট রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে পরিব্রাজক হিউয়েন শাঙ লিখেছেন-

'সম্রাট হর্ষবর্ধন কনৌজে এক বিরাট উৎসবসভার আয়োজন করলেন, তাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মের বিপুল সংখ্যক পুরোহিত ও ধর্মীয় পন্ডিত অংশগ্রহন করেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন গেওতম বুদ্ধের একটি স্বর্ণমূর্তী তৈরি করে পঞ্চাশ হাত উচুঁ এক বিশাল স্তম্ভের উপর তা স্থাপন করেন এবং অপেক্ষাকৃত ছোট একটি মূর্তী নিয়ে জাকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রায় বের হন।সম্রাট হর্ষবর্ধন স্বয়ং বুদ্ধ মূর্তির পাশে অবস্থান গ্রহন করে ছত্রদন্ড বহন করেন। আর সম্রাটের মিত্র রাজা কামরূপ (ঝালর দুলিয়ে) 'মাছি-নিবারণ'-এর দায়িত্ব পারন করেন।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরিবার ও সভাসদবর্গের ধর্মপরিচয় সম্পর্কে হিউয়েন শাঙ লিখেছেন-

তাদের কেউ ছিলো শিবের পূজারী, কেউ বৌদ্ধধর্মের অনুসারী; কেউ সূর্যদেবতার পূজা করতো, কেউ করতো বিষ্ণুপূজা। প্রত্যেক স্বাধীনতা ছিলো নির্দিষ্ট কোনো একটি দেবতার, কিংবা সর্বদেবতার উপাসনা করার।

হিন্দু সমাজে নারীর মর্যাদা :

ব্রাক্ষমনদের সমাজ-সভ্যতায় নারী জাতির সেই সম্মান ও মর্জাদা ছিলো না, যা বৈদিক যুগে ছিলো। ডক্টর লী বোন- এর মতে মনুশাস্ত্রে স্ত্রীজাতিকে দুর্বল ও বিশ্বাসঘাতিনী ভাবা হয়েছে এবং ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাষায় তার আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত মনুযুগের হিন্দুসমাজে নারীর মর্যাদা দাসীর চেয়ে বেশী কিছু ছিলো না। জুয়া খেলায় পুরুষ স্ত্রীকে বাজি ধরতো এবং হেরে গিয়ে স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলে দিত। বিধবাদের জীবণ ছিলো মৃত্যুর চেয়ে বিভীষিকাপূর্ণ। তার দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার ছিলো না। সমাজ ও পরিবারের লাঞ্চনা-গঞ্জনাই ছিলো তার ভাগ্যলিপি। মৃত স্বামীর গৃহে দাসিবৃত্তি করেই তাকে জীবন ধারন করতে হতো।অনেক ক্ষেত্রে বিধবা নারী (স্বেচ্ছায় কিংবা জবরদস্তি) স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করতো, যার নাম ছিলো সতীদাহ। ডক্টর লি বোন বলেন-'স্বামীর চিতায় বিধবাকে জ্বালানোর বিধান মনুশাস্ত্রেযদিও নেই,তথাপি মনে হয় এ প্রথা ভারতবর্ষে ব্যাপক ছিলো। কেননা গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এর উল্লেখ করেছেন।

এভাবেই যে উর্বর ভারতভূমি ছিলো মেধায়, সম্পদে পরিপূর্ণ, একসময় তাই হয়ে পড়েছিলো মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ,দারিদ্র্য ও নৈরাজ্যের শিকার। যে জাতি সম্পর্কে কোন কোন আরব ঐতিহাসিক লিখেছেন,'জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আধার;ন্যায়,সুশাসন,বিচক্ষণতা ও সুশীল চিন্তার উৎস সে জাতিই দীর্ঘকাল আসমানী সত্যধর্মের শিক্ষা হতে বঞ্চিত থাকার কারণে বিভিন্ন আচার-অনাচার ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। । নিকৃষ্টতমমূর্তিপূজার পাশাপাশি ছিলো প্রবৃত্তিপূজার জয়জয়কার। সর্বোপরি ধর্মের নামে এমন বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও শ্রেনীবৈষম্য বিদ্যমান ছিলো,যার নযির পৃতিবীর অন্য জাতির ইতিহাসে নেই।

ক্রুসেডের বিভীষিকা

আধ্যাত্মিক দিক থেকে পশ্চিমারা সম্পূর্ণ দূরে সরে গিয়েছে। এটা একটা দিক। এই দিকটা ছাড়াও অন্য আরেকটি কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ থেকে মুসলিমদের বিরত থাকা উচিত। সেটা হলো, পশ্চিমারা তাদের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জিকে ইসলাম-বিদ্বেষের মোড়কে সাজিয়ে নিয়েছে।ক্ষেত্র-বিশেষে এটা প্রচীন ইউরোপ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার। গ্রিক এবং রোমানরা স্রেফ নিজেদেরকেই 'সভ্য' বিবেচনা করত। আর ভিনদেশীদের, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পূর্বদিকের বাসিন্দাদেরকে বলত 'বর্বর'। মূলত সেই সময় থেকেই অন্য সবার চাইতে পশ্চিমারা নিজেদেরকে 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হিসেবে বিশ্বাস করে আসছে। অ-ইউরোপীয়দের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা পশ্চিমাদের একটি অন্যতম রীতি।তবে ইসলামের প্রতি তাদের মনোভাব কী, সেটা বোঝার জন্যে কেবল এই দিকটাই যথেষ্ট নয়। ভিনদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতির দিকটা আলোচনা করতে গিয়ে, তারা শুধু ইসলামের ক্ষেত্রেই পুরোপুরি আলাদা একটি অবস্থান নেয়। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সুদূরপ্রসারী এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি বলা যায়। এটা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক কারণেই তৈরি হয়নি। এর সাথে জড়িয়ে আছে এক অতিরঞ্জিত আবেগ। পশ্চিমারা হয়তো বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু দর্শনকে সত্য বলে স্বীকার করে না। কিন্তু এসবের ব্যাপারে তারা সব সময় ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখে। অন্তত এগুলোকে বিচার-বিবেচনাযোগ্য তত্ত্ব বলেমনে করে। কিন্তু তারা যখনি ইসলামের দিকে দৃষ্টি দেয়, তাদের নিরপেক্ষ অবস্থান ব্যহত হয়। এক ধরনের আবেগী পক্ষপাত কাজ করতে শুরু করে। ইউরোপের অনেক নামকরা প্রাচ্যবিদরাও ইসলামের ব্যাপারে কলম ধরতে গিয়ে বিজ্ঞানবিরোধী একচোখা আচরণ করেছেন। এজন্যে তারা অবশ্যই দায়ী। তাদের পর্যালোচনা দেখলে মনে হয়–ইসলামকে 'জীবনদর্শন' হিসেবে মেনে নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানোটা কোনো অপরাধ। বরং ইসলামকে মনে করতে হবে বিচারকের সামনে দাঁড়ানো একজন অভিযুক্ত আসামি। কিছু কিছু প্রাচ্যবিদ সরকারি জজের মতো দণ্ডাদেশ দেওয়ার ভূমিকা পালন করবেন। অন্যান্যরা আসামির পক্ষে এমনভাবে উকালতি করবেন, যারা ইতিমধ্যেই তাদের মক্কেলকে অপরাধী হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু 'আমার মক্কেল তো অবস্থার স্বীকার'–এই ধরনের কথা বলে দায়সারা অজুহাত পেশ করছেন।প্রাচ্যবিদদের এই ধরনের বিচারপদ্ধতি ও উকালতি দিনশেষে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় ক্যথলিক গির্জার হাতেগড়া কুখ্যাত আদালতগুলোর কথা। কথিত 'ধর্মদ্রোহীদের' বিচার করা জন্যে মধ্যযুগে তা স্থাপন করা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, প্রাচ্যবিদরা খুব কমই নিরপেক্ষ মন নিয়ে ঐতিহাসিক সত্যতার অনুসন্ধান করে থাকেন। বরং শুরু থেকেই একপাক্ষিক অবস্থান নিয়ে পূর্বনির্ধারিত একটি সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দেন। তারা যে উপসংহারে পৌঁছতে চান, সে অনুযায়ী নিজেদের পক্ষে একতরফা প্রমাণ পেশ করেন। যেখানেতারা তাদের পক্ষে কোনো দলিল সাব্যস্ত করতে পারেন না, সেখানে কাটছাঁট করে সাক্ষীদের অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি টেনে আনেন। কিংবা (ইসলামের প্রতি) বিদ্বেষ থাকার কারণে, সাক্ষীদের তথ্য-প্রমাণকে অপব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের উত্থাপিত দলিলগুলোকে পাঁচ পয়সারও দাম দেন না। ফলে, প্রাচ্যবিদ কিংবা পশ্চিমাদের লেখনীতে আমরা ইসলাম ও মুসলিমদের এক বিকৃত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।বিকৃতির এই ধারা কেবল একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইংল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি এবং হল্যান্ডের মতো দেশগুলোতেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানেই প্রাচ্যবিদরা ইসলাম নিয়ে নাক গলিয়েছে, সেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে। তীর্যক মন্তব্য করার জন্যে বাস্তবিক বা কাল্পনিক ছুতা খুঁজে বেড়ানোর খায়েশ, সব সময় তাদের মধ্যে ছিল। এর মাধ্যমে তারা পাশবিক আনন্দ পেত।প্রাচ্যবিদরা নিজেরা কোনো বিশেষ জাতি নয়। তারা নিজ নিজ সমাজ- সভ্যতার প্রতিনিধি। তাই আমারা এই উপসংহারে আসতে বাধ্য হই যে, বেশকিছু কুধারণা ও একপাক্ষিক চিন্তা-ভাবনার কারণে ধর্মতত্ত্ব এবং সভ্যতা হিসেবে প্রাচ্যবিদরা ইসলামকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। এর একটি কারণ হলো, তাদের পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী গোটা বিশ্বকে 'সভ্য' ও 'বর্বর' এই দুটি ভাগে বিভক্ত করা। আরেকটি কারণ সরাসরি ইসলাম- (বিদ্বেষী মনোভাবের) সাথে জড়িত। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে, বিশেষ করে মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিষয়টা ফুটে ওঠে।ইউরোপীয় জোট এবং ইসলামি দুনিয়ার সাথে বড় মাপের সংঘর্ষ বাধেক্রুসেডের সময়। মূলত এর মাধ্যমেই পাশ্চাত্য সভ্যতা (পুরোপুরি ইসলামের) সংস্পর্শে আসে। ওই সময়ে ইউরোপীয় সভ্যতা গির্জার সাথে আঁটঘাট বেঁধে রেখেছিল। রোমান সভ্যতার পতন-পরবর্তী এই অন্ধকার যুগটাতো। পশ্চিমারা চোখমেলে দেখতে শুরু

করেছিল। তার সাহিত্যকলার ওপর ঝিরিঝিরি করে বইছিল হিমেল হাওয়া। গথ, হান এবং এভারদের প্রবল আক্রমণের কারণে স্থাবর হয়ে পড়েছিল যে চারুকলা, তার অঙ্কুরোদগম হচ্ছিল ধীরে ধীরে। মধ্যযুগের বর্বরতা কাটিয়ে সে-সময় ইউরোপে শুরু হয়েছিল নবজাগরণ। এর ফলে খুলে গিয়েছিল সংস্কৃতির এক নতুন দিগন্ত। আর এরই হাত ধরে বাড়ছিল অনুধাবনের ক্ষমতা।ঠিক এ সময়টাতেই ইসলামি বিশ্বের সাথে তার বৈরী যোগাযোগ শুরু হয় ক্রুসেডের হাত ধরে। তবে ক্রুসেড শুরুর আগ থেকেই মুসলিমদের সাথে ইউরোপের সংঘর্ষ দানা বেঁধেছিল। কারণ, আরবরা দখল করে নিয়েছিল সিসিলি এবং স্পেন। অভিযান চালিয়েছিল ফ্রান্সের দক্ষিণভাগে। কিন্তু এ-সবই ছিল খ্রিস্টবাদে দীক্ষিত ইউরোপের সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হবার পূর্বের ঘটনা। তাই ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে তখন দেখা হয়েছে স্থানীয় সমস্যা হিসেবে। ব্যাপারটিকে ওরা তেমন আমলে নেয়নি। একমাত্র ক্রুসেড যুদ্ধই ইসলামের সাথে ইউরোপের এমন (বৈরী) সম্পর্ক তৈরি করে–বহু শতাব্দী ধরে যা চলে আসছে।ক্রুসেড যেন আবশ্যক বিষয় ছিল। কারণ, সময়টা ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার বাল্যকাল। ওই সময়ে তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেতে শুরুকরেছিল। হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে তার বিকাশ ঘটছিল। শৈশবের দুরন্তপনার ছাপ যেমন চেতন বা অবচেতনভাবে মানুষের পরবর্তী জীবনে দেখতে পাওয়া যায়, জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটা ঘটে। সেসব দুরন্তপনা এমনভাবে গেঁথে যায় যে, পরবর্তী সময়ে তা ছেড়ে দেওয়াটা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতা বাড়লেও, কিংবা আবেগী সময় পাড়ি দিয়ে অভিজ্ঞ হয়ে গেলেও সেগুলো ছাড়া দায়।ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই ঘটেছে। এগুলো ইউরোপীয়দের মনে বেশ গভীর এবং স্থায়ী রেখাপাত করে। ওই সময় তাদের প্রতিটি স্তরে যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, গোটা ইউরোপ আর কখনোই তা প্রত্যক্ষ করেনি। পরবর্তী সময়ের কোনো কিছুর সাথেই এর তুলনা চলে না। উন্মাদনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে পুরো মহাদেশ জুড়ে। উল্লাসে ফেটে পড়তে থাকে সবাই। কিছু সময়ের জন্যে হলেও জাতি-রাষ্ট্র-গোত্রগুলোর মধ্যে একতা তৈরি হয়। ইতিহাসে প্রথম বারের মতো জোটবদ্ধ হয় ইউরোপ। এই ঐক্য ছিল ইসলামি দুনিয়ার বিরুদ্ধে।কোনো প্রকার রাখঢাক না করে আমরা বলতে পারি, ক্রুসেডের উন্মাদনা থেকেই জন্ম হয় আধুনিক ইউরোপের। এর পূর্বে তারা প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষা এবং জার্মানি, ফরাশি, নরম্যান[৫], ইতালিয়ান, ড্যানিশ ইত্যাদি (জাতীয়তাবাদী পরিচয়ে) বিভক্ত ছিল। কিন্তু ক্রুসেডের সময় ইউরোপের জাতি-রাষ্ট্রগুলো 'খ্রিস্টেনডম'[৫৩]নামক নতুন একটি রাজনৈতিক ধারণার জন্ম দেয়। অথচ খ্রিস্টধর্মের সাথে এর কোনো যোগসাজস ছিল না। মূলত এর পেছনে গডফাদার হিসেবে কাজ করেছিল 'ইসলাম-বিদ্বেষ'। এটি ইতিহাসের সম্মিলিত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই চেতনার পেছনেঅকপটে কলকাঠি নেড়েছে খ্রিস্টান গির্জা।[৫৪] অথচ গির্জার সকল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মাধ্যমেই কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এতখানিউন্নত হতে পেরেছে।গির্জা এবং ইসলাম–উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই ক্রুসেড ছিল একটি মর্মান্তিক পদক্ষেপ। গির্জার জন্যে মর্মান্তিক এই কারণে যে, চমৎকার একটি যাত্রা শুরু করার পরেও ইউরোপের চিন্তাধারার ওপর সে তার প্রভাব ধরে রাখতে পারেনি। আর ইসলামের জন্যে মর্মান্তিক হবার কারণ হলো, বহু শতাব্দী ধরে ক্রুসেডের আগুন তাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ক্রুশ বহনকারী তথাকথিত ধার্মিক যোদ্ধারা ইসলামের যেসব অঞ্চল দখল করেছিল এবং যেগুলো পরবর্তী সময়ে ছেড়ে দিয়েছিল, সেখানে অকথ্য বর্বরতা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল।[৫৫] এর মাধ্যমেই তারা দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতার বিষাক্ত বীজ বপন করে। যা এখনো পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ককে বিষাদময় করে রেখেছে। এটাই হলো বৈরীতার সুপ্ত কারণ।ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার আধ্যাত্মিক ভিত্তি এবং সামাজিক লক্ষ্য আলাদা। এরপরও একে-অপরকে বরদাস্ত করার সুযোগ ছিল। নিজেদের মাঝে সৌহার্দ্য বজায় রেখে তারা পাশাপাশি অবস্থান করতে পারত। স্রেফ তাত্ত্বিকভাবেইনয়, বাস্তবেও এটা সম্ভব ছিল। মুসলিমদের পক্ষ থেকে আন্তরিকতা এবং সম্মানের নজির সব সময়ই দেখতে পাওয়া যায়। খলিফা হারুনুর রশীদ এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই সম্রাট শার্লেমনের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন।[৫৬] মূলত ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বাস্তবিক অর্থে লাভবান হওয়ার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। কিন্তু সে-সময়টাতে ইউরোপের সংস্কৃতি এতটাই বর্বর ছিল যে, এ ধরনের সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা করেনি। অবশ্য (খলিফার) এই পদক্ষেপকে তারা খারাপ চোখেও দেখেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আচমকা বেজে ওঠে ক্রুসেডের দামামা। ফলে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্ক বানচাল হয়ে যায়।কোনো গতানুগতিক যুদ্ধের কারণে এমনটা হয়নি। জাতিসমূহের মাঝে তো কত যুদ্ধই হয়ে থাকে। সময় গড়ালে ইতিহাস থেকে সেসব মুছেও যায়। কত শত্রুতাই তো বন্ধুত্বের রূপ ধারণ করে। কিন্তু ক্রুসেডারদের

বর্বরতা স্রেফ অস্ত্রের ঝনঝনানিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মোটাদাগে এটা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন। মুসলিম-বিশ্বের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে খেপিয়ে তোলা হয়েছিল গোটা ইউরোপের চিন্তা-চেতনাকে। ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনের বিরুদ্ধে আষাঢ়ে গল্প সাজিয়ে, তিলকে তাল বানিয়ে ফেলেছিল গির্জার পাদরিরা। ইসলাম হলো অসভ্য ও বর্বর ধর্ম, আত্মশুদ্ধির তুলনায় লৌকিকতা এখানে বেশি প্রাধান্য পায়–এই ধরনের উদ্ভট চিন্তাধারা ইউরোপের মন-মগজে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। আর বহুকাল ধরে তা বদ্ধমূল থেকে যায়।ক্রুসেডের উন্মাদনার প্রভাব পড়ে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলগুলোতেও।[–"অসভ্য মানুষের জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলার জন্যে উদ্‌বুদ্ধ হয় স্পেনের খ্রিস্টানরা। মুসলিম (শাসিত) স্পেনে ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকে লম্বা সময় ধরে। দীর্ঘস্থায়ী এই বিবাদের ফলে ইউরোপীয়দের মাঝে ইসলাম-বিদ্বেষ আরও তীব্র হয় এবং প্রকট আকার ধারণ করে। এর ফলে অকথ্য বর্বরতার মাধ্যমে স্পেনের মুসলিম ঐতিহ্যকে উপড়ে ফেলা হয় সুকৌশলে। আর গগন-বিদারী উল্লাসের মাধ্যমে এ বিজয় প্রতিধ্বনিত হয় গোটা ইউরোপ জুড়ে। এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইতি ঘটে গৌরবময় এক সভ্যতার। মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও অসভ্যতা মনে করে একে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। স্পেনে মুসলিম-শাসনের শেষ নিদর্শন হিসেবে টিকে ছিল গ্রানাডা রাজ্য। কিন্তু ১৪৯২ সালে খ্রিস্টানরা তা পুনর্দখল করে।তৃতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ইসলামের সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হয়। সেটা হলো, তুর্কিদের হাতে কনস্টান্টিনোপল এর পতন।[৮] ইউরোপীয়দের চোখে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তখনো প্রাচীন গ্রিক ও রোমানদের ঐতিহ্য ধরে রেখেছিল। এই সাম্রাজ্য ছিল এশিয়ার বর্বরদের হাত থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ! কিন্তু বাইজান্টাইন পতনের ফলে মুসলিমদের জন্যে ইউরোপের দুয়ার খুলে যায়। পরবর্তী যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শতাব্দীগুলোতে এই ধারা অব্যাহত থাকে। ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপের শত্রুতা কেবল সাংস্কৃতিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রাজনৈতিকভাবেও তা গুরুত্ব পায়। আর রাজনৈতিক (পদক্ষেপ, শত্রুতার) আগুনে ঘি ঢালে।এসব যুদ্ধ থেকে বেশি লাভবান হয় ইউরোপ। রেনেসাঁসের মাধ্যমে ইউরোপে শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ ঘটে। আর (রেনেসাঁসের সব)উপকরণ ধার করা হয় ইসলামি দুনিয়া থেকে। বিশেষ করে আরবদের কাছ থেকে। অবশ্য এর পেছনে পূর্ব-পশ্চিমের বৈষয়িক সম্পর্ক অনেকাংশে দায়ী। এর ফলে সভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ইসলামি বিশ্বের চেয়ে ইউরোপ একধাপ বেশি অগ্রসর হয়। মুসলিমদের অবদান এই ক্ষেত্রে অনেক। কিন্তু ইসলাম-বিদ্বেষের পূর্ব জের ধরে ইউরোপ কখনোই এটা স্বীকার করতে চায়নি। অন্যদিকে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তাদের ঘৃণা। একসময়ে এটা 'প্রথা' হিসেবে রূপ নেয়। পশ্চিমা জনসাধারণের সামনে 'মুসলিম' শব্দটা উচ্চারণ করলেই (ওদের মনে) কেমন জানি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। সর্বমহলে এটি যেন নীতিবাক্যে পরিণত হয়েছে। এই ঘৃণা খোদাই করে দেওয়া হয়েছে ইউরোপের প্রতিটি নর-নারীর অন্তরে।সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, এত এত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এই ধারণা আজও টিকে আছে। সংস্কার আন্দোলনের সময় খ্রিস্টান উপদলগুলো দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। কিন্তু ওই মুহূর্তেও ইসলাম-বিদ্বেষ ছিল তাদের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। তারপর এমন এক সময় এল, যখন ইউরোপের ধর্মীয় অনুভূতির অবক্ষয় হতে লাগল। কিন্তু ইসলাম-বিদ্বেষ রয়েই গেল (তাদের অন্তরে)। এর বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক 'ভলতেয়ার' এর মাধ্যমে। ১৮শ শতকের দিকে যিনি ছিলেন গির্জার অন্যতম প্রধান শত্রু। একইসাথে তিনি ছিলেন ইসলাম এবং নবিজির কট্টর দুশমন। কিছু দশক পর এমন এক সময় আসে, যখন পাশ্চাত্যের শিক্ষিত গোষ্ঠী অনান্য সভ্যতা নিয়ে গবেষণা শুরু করে। এগুলোকে তারা দেখতে থাকে সহানুভূতির নজরে। একমাত্র ইসলামের ক্ষেত্রেই তাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে চিরাচরিত বিদ্বেষ এসে জায়গা করে নেয়। এটাকে বলা যায় অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব।ইউরোপ এবং ইসলামি দুনিয়ার মধ্যে ইতিহাস যে সাংস্কৃতিক ফাটল তৈরি করেছিল, দুর্ভাগ্যবশত তা আজও মেটেনি। ইসলাম-বিদ্বেষ ইউরোপীয় চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা সত্যি যে, আধুনিক জমানার (শুরুর দিকে) প্রাচ্যবিদরা ছিল খ্রিস্টান মিশনারি। এরা মুসলিম দেশগুলোতে কাজ করত। ইসলামি আদর্শ ও ইতিহাসের যে বিকৃত তারা চিত্র অঙ্কন করেছিল, তা অনেকাংশেই 'বর্বরদের' প্রতি ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। 'প্রাচ্যতত্ত্ব' অনেক আগেই মিশনারিদের থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তারপরও পশ্চিমাদের চিন্তার বিভ্রাট কাটেনি। তাই, ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে–এই ধরনের অজুহাত পেশ করার সুযোগ নেই। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এই একচোখা দৃষ্টিভঙ্গি মূলত পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পাওয়া। ক্রুসেড এবং এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের কারণে

ইউরোপীদের মনে যে গভীর প্রভাব পড়েছিল, তার ভিত্তিতেই এই মানসিকতা গড়ে ওঠে।[৫৯]পশ্চিমাদের ধর্মীয় অনুভূতি তো এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন বলা চলে। তা হলে গির্জার আধ্যাত্মিক প্রভাবের কারণে সৃষ্ট সেই পুরোনো বিদ্বেষ কী করে এখনো স্থায়ী হতে পারে?−হয়তো এই ধরনের প্রশ্ন জাগতে পারে।বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘটনাটা পরস্পর-বিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু একজন অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর কাছে এটা মোটেই আশ্চর্যজনক কিছু নয়। তিনি জানেন, মন-মগজে গেঁথে দেওয়া ছেলেবেলার ধর্মবিশ্বাসকে একজন ব্যক্তি হয়তো ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু ওই বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত কিছু কুসংস্কার ব্যক্তির অন্তরে বদ্ধমূল থেকেই যায়। আর ওই কুসংস্কার ব্যক্তির যৌক্তিক চিন্তাধারাকে সারাটা জীবন প্রভাবিত করে।ইসলামের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক এমন। যদিও ইসলাম-বিদ্বেষী মনোভাবের পেছনে যে ধর্মীয় অনুভূতি কলকাঠি নাড়ত, ইতিমধ্যেই সেটা পুরোপুরি বস্তুবাদী রূপ নিয়েছে। তারপরও পশ্চিমাদের মনে অবচেতন-ভাবেই সেই পুরোনো বিদ্বেষ এখনো রয়ে গিয়েছে। অবশ্য এই বিদ্বেষের মাত্রা একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম। কিন্তু এটার অস্তিত্ব বিলীন হয়নি কখনো। ক্রুসেডের প্রেতাত্মা আজও চুপিসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাশ্চিমা জগতে। আর মুসলিম-বিশ্ব এবং ইসলামি অনুশাসনের ব্যাপারে পশ্চিমাদেরকে সেপ্রভাবিত করে যাচ্ছে।“অতীতের ভয়াবহ সংঘাতের কারণে ইসলামের প্রতি পশ্চিমাদের যে বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল, আজ সেটা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে”- এই ধরনের কথা প্রায়ই শোনা যায় মুসলিমদের কাছ থেকে। এমনকি এটাও বলা হয় যে, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা হিসেবে ইসলামকে বেশ গুরুত্বের সাথে দেখছে পশ্চিমারা। আসলে ইউরোপ-আমেরিকানদের ফাঁকা বুলিকে অসংখ্য মুসলিম সত্য বলে বিশ্বাস করে। এই ধারণা হয়তো তাদের জন্যে মানানসই, যারা বিশ্বাস করেন−সকল ধর্মের মধ্যে ইসলামই কেবল মানুষের ফিতরাতগত চাহিদা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো উপলব্ধি করতে পারে। তাই ইসলামই হলো সমাজের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তা ছাড়া আমাদের নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে গিয়েছেন, কিয়ামতের আগে পুরো মানবজাতি ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসবে। [৬০]কিন্তু খুব শীঘ্রই যে এমনটা ঘটতে পারে, দুর্ভাগ্যবশত তার কোনো নজির আমাদের হাতে নেই। ভবিষ্যতে হয়তো তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসবে। স্রেফ তখনি এটা সম্ভব হবে, যখন পশ্চিমা বিশ্বে একের-পর-এক ভয়াবহ সামাজিক বিপর্যয় ঘটতে শুরু করবে। এর ফলে আপন সভ্যতা নিয়ে তাদের যে অহমিকা ছিল, তা ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। আর পাশ্চাত্যের মনোভাব এমনভাবে পাল্টে যাবে যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের ব্যখ্যাকে মেনেনিতে সে বাধ্য হবে। হয়তো এভাবেই তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসবে। পশ্চিমা সভ্যতা আজ বস্তুগত উন্নতির পুজো করছে। স্রেফ আরাম-আয়েশই তাদের জীবন-সংগ্রামের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ধর্মীয় চিন্তাধারাকে প্রকাশ্যে উপহাস করার প্রবণতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশাবাদী মুসলিমরা আমাদেরকে যা গেলাতে চায়, সে হারে (এই ধর্ম-বিদ্বেষী) প্রবণতা মোটেও কমবে বলে মনে হয় না। আজকাল বলা হচ্ছে, প্রকৃতির দৃশ্যমান গঠনপ্রণালীর পেছনে একজন একক স্রষ্টার অস্তিত্বকে আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করতে শুরু করেছে। আর ওইসব আশাবাদী লোকেরা এই ধারণাকে পশ্চিমাদের ধর্মীয় জাগরণ হিসেবে ধরে নিয়েছে। অথচ পশ্চিমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাথে একক স্রষ্টার ধারণাবড্ড বেমানান।মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে একক সক্রিয় উদ্দেশ্য আছে−প্রকৃত বিজ্ঞানীরা এই ধারণাকে কখনো অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু চিরকাল ধরে এই প্রশ্ন করা হচ্ছে, এই উদ্দেশ্যের পেছনে কে দায়ী। ধর্মীয় মতবাদগুলো বলে, এর পেছনে এমন এক সত্তা দায়ী, যিনি অসীম জ্ঞান এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি এমন এক সত্তা, যিনি সুনির্ধারিত এক লক্ষ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরিচালনা করছেন। যিনি পরম সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞানী। যিনি কোনো বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এককথায় তিনি হলেন মহান স্রষ্টা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে কোনো প্রকার ইচ্ছা বা আগ্রহ পোষণ করে না। আসলে এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রের মধ্যেই পড়ে না। ওই সত্তার সূক্ষ্মদর্শীতা, অমুখাপেক্ষীতা এবং তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার দিকটাকে বিজ্ঞান খুব কমই খোলাসা করে থাকে। বিজ্ঞানের মনোভাব অনেকটা এরকম−“হ্যাঁ, এমনটা হতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আসলে এটা জানার বৈজ্ঞানিক কোনো উপায় নেই।”ভবিষ্যতে এই দর্শন হয়তো একধরনের সর্বেশ্বরবাদী। সংশয়ে রূপ নিতে চধহঃযবরংস বা সর্বেশ্বরবাদ একটি দার্শনিক মতামত। এই মতের অনুসারীরা বিশ্বাস করে, ঈশ্বর বিশ্বজগতের বাইরের কেউ নন। বিশ্ব বা প্রকৃতিই ঈশ্বর। এত মতবাদ যারা মেনেপারে। যেখানে আত্মা ও শরীর, উদ্দেশ্য ও অস্তিত্ব স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে একাকার করে ফেলা হবে। তাই পশ্চিমারা স্রষ্টার ইসলাম-সম্মত ধারণার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে,

এই কথা মেনে নেওয়া আমাদের জন্যে কষ্টকর। কারণ, তারা বস্তুবাদকে বিদায় জানাচ্ছে না। বরং এটাকে নিয়ে যাচ্ছে আরও উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে।৬। বর্তমান জমানার মতো পশ্চিমারা আর কখনোই ইসলামকে এতটা অবজ্ঞার চোখে দেখেনি। আমাদের দ্বীনের প্রতি তাদের শত্রুতা হয়তো-বা খানিকটা কমেছে। কিন্তু এটা কখনোই ইসলামি ভাবাদর্শের প্রতি তাদের সম্মান-প্রদর্শনের কারণে নয়। বরং ইসলামি বিশ্বের সাংস্কৃতিক দুর্বলতা এবং অনৈক্যের ফসল।একটা সময় গোটা ইউরোপ ইসলামের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। এই ভীতিই তাকে ইসলামের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক রীতিনীতি-সহ সকল জিনিসের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে বাধ্য করত। কিন্তু এখন তো পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রভাব অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুতরাং পাশ্চাত্যের তীব্র ইসলাম-বিদ্বেষী মনোভাবে ভাটা পড়াটা খুবই মামুলি ব্যাপার। ধরে নিলাম, তারা ইসলাম-বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড নিয়ে মাথা কম ঘামায়। কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা কখনোই উপসংহার টেনে বলতে পারব না—পশ্চিমারা ইসলামের নিকটবর্তী হচ্ছে। এটা তো ইসলামের প্রতি তাদের চলমান অবজ্ঞাকেই নির্দেশ করে।[৬৩]পাশ্চাত্য সভ্যতা তার এই অদ্ভুত মানসিকতাকে কখনোই পরিবর্তন করেনি। ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে গিয়ে জীবন পরিচালনার রীতি—অতীতের মতোই সে বহাল রেখেছে। একটু আগেই বলেছি, খুব শীঘ্রই যে পশ্চিমাদের এই অবস্থান পাল্টে যাবে, তার নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম সচল থাকা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা পুরোপুরি উপলব্ধি না করেই ইউরোপ-আমেরিকার কিছু অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণএর পক্ষে দলিল হতে পারে না। আজ সেখানে চলছে বস্তুবাদের জয়জয়কার। তাই এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এখানে-ওখানে কিছু মানুষ নিজেদের আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্যে ধর্মীয় কথা শুনতে আগ্রহ দেখাবে। মনে রাখা দরকার, পশ্চিমা বিশ্বে স্রেফ মুসলিমরাই দাওয়াতি কার্যক্রম চালাচ্ছে না। সেখানে অনেক খ্রিস্টান গ্রুপও রয়েছে, যারা (খ্রিস্টধর্মের) পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী।ব্রাহ্মবাদী আন্দোলন। সেখানে বেশ শক্তিশালী। সেখানে রয়েছে বৌদ্ধদের মন্দির এবং দাওয়াতি কার্যক্রম। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইউরোপ-আমেরিকার বহু শহরে। তর্কের খাতিরে মুসলিম দাঈদের মতো সেখানকার বৌদ্ধরাও দাবি করতে পারে—ইউরোপ ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের নিকটবর্তী হচ্ছে।দু-দলের দাবিই হাস্যকর। কিছু মানুষের ইসলাম বা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কখনোই এটা প্রমাণ করে না যে, এই মতবাদের কোনো-একটি পাশ্চাত্যের জীবনধারাকে উল্লেখযোগ্য হারে প্রভাবিত করছে। কেউ হয়তো একটু আগবাড়িয়ে বলতে পারে, এসব ধর্ম প্রচারকারীরা ইউরোপে সামান্য কৌতুহল জাগানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। বহিরাগত ধর্মবিশ্বাস (পশ্চিমের) কল্পনাবিলাসী মানুষদের অন্তরে এক ধরনের মোহ সৃষ্টি করেছে। মূলত এ কারণেই এমনটা ঘটছে। অবশ্যই সেখানে কিছু ব্যতিক্রম মানুষ রয়েছেন। আছেন কিছু ধর্মান্তরিত ব্যক্তি। তারা হয়তো আন্তরিকতার সাথে সত্যকে তালাশ করেন। কিন্তু এই অল্প সংখ্যক মানুষ তো আর গোটা সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টাতে পারবেন না। পশ্চিমের এসব ব্যতিক্রমী লোকদের সংখ্যার সাথে মার্কসবাদ বা এই ধরনের বস্তুবাদী চিন্তাধারা লালনকারী মানুষদের তুলনা করে দেখতে পারি। এর মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতার আসল চরিত্র আরও গভীরভাবে বুঝতে পারব।ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, একের-পর-এক অবিশ্বাস্য মাত্রার বিশ্বযুদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক সন্ত্রাস। হয়তো লোমহর্ষক পন্থায় পশ্চিমা সভ্যতার বস্তুবাদী আহমিকাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। আর তখনআন্তরিকভাবে এবং উদারতার সাথে পশ্চিমারা আবারও বেরিয়ে পড়বে সত্যের খোঁজে। স্রেফ তখনি পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের প্রসার বেগবান হবে। কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তন বহুত দূর কি বাত। সুতরাং, ইসলামি প্রভাব পশ্চিমাদের চিন্তাধারাকে বশীভূত করে ফেলছে, এমনতরো দাবি মুসলিমদের জন্যে বেশ খতরনাক ও আত্মপ্রবঞ্চণা-দায়ক আশাবাদ। এই ধরনের কথাবার্তা আসলে যুক্তিবাদের মোড়কে ঢাকা প্রাচীন মাহদীবাদের ওপর বিশ্বাস ছাড়া কিছুই না। (দ্বীনকে বিজয়ী করার কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে শুধু) এমন এক শক্তির ওপর আস্থা রাখা—যা হঠাৎ করেই প্রকাশিত হবে, আর মুসলিমদের ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থাকে জমিনের ওপর বিজয়ী করবে।

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা

যেদিন থেকে মুসলিমরা নিজেদের স্থবির সমাজব্যবস্থার পুনর্জাগরণের জন্যে পশ্চিমাদের অনুকরণকে একমাত্র উপায় হিসেবে ভেবে নিয়েছে, সেদিন থেকেই তারা আত্মমর্যাদা খুইয়ে ফেলেছে। আর 'ইসলাম একটি মৃতপ্রায় শক্তি'–পাশ্চাত্যের এই দাবিকেও পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছে।ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা পুরোপুরি ভিন্ন দুটি জীবনবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মূলনীতির দিক থেকেও একটি অপরটির জন্যে মানানসই নয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই মতের পক্ষে আমি যুক্তি দেখিয়েছি। পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা ওদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক দর্শন ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তখন আমরা কী করে এটা আশা করতে পারি : পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম যুবকরা ইসলাম-বিদ্বেষী মনোভাব থেকে বেঁচে থাকতে পারবে?এর পক্ষে কোনো যুক্তি দেখানোর সুযোগ নেই। হয়তো তুখোড় মেধাবী কিছু যুবক ওদের সাথে টেক্কা দিয়ে চলতে পারবে। তবে এটা খুবই বিরল ঘটনা। পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা নবিজির বার্তার প্রতি মুসলিম যুবকদের আস্থাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ধর্মীয় চেতনায় বলীয়ান ইসলামি সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে তৈরি হওয়ার আকঙ্ক্ষাকে নষ্ট করে ফেলছে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা পশ্চিমা মূল্যবোধকে আপন করে নিয়েছেন, ইসলামি বিশ্বাস থেকে তারা অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছেন।[৬৯] এ ব্যাপারে কোনোসন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য আমরাএটা বোঝাচ্ছি না যে, ইসলামস্রেফ অশিক্ষিত লোকদের বাস্তব জীবনেই নির্ভেজাল অবস্থায় টিকে আছে। কিন্তু একটা কথা মানতেই হয়–ইসলামের - পাশ্চাত্য-ঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের চাইতে এদেরকেই আমরা বেশি তৎপর দেখি। হতে পারে তাদের বুঝ কিছুটা ভাসাভাসা। শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বীন-বিমুখ হওয়ার কারণ এটা নয় যে : পশ্চিমাদের যে বিজ্ঞান চর্চা করতে করতে তারা বেড়ে উঠেছেন, সেটা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো যৌক্তিক প্রমাণ হাজির করতে পেরেছে। আসলে পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎটাই ধর্ম-বিদ্বেষী। এটা মুসলিম প্রজন্মের ধর্মীয় প্রতিভার ওপর ভারী বোঝাচাপিয়ে দিয়ে (একে পিষ্ট করে ফেলেছে)।স্রেফ যুক্তিতর্কের ওপর নির্ভর করে ধর্মকে বিশ্বাস-অবিশ্বাস করাটা খুবই বিরল ঘটনা। আমরা বলে পারি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান অথবা ধীশক্তির কারণে কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ তার সাংস্কৃতিক বলয়ের মাধ্যমে এই বুঝ অর্জন করে। একটি বাচ্চার কথা চিন্তা করুন। বাল্যকাল থেকেই যাকে বাদ্যযন্ত্রের জমকালো সুরের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে 'সুর-তাল-লয়' শুনে ওর কান অভ্যস্ত। পরবর্তী সময়ে যদি-সে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে কিংবা গান গাইতে নাও পারে, অন্তত কঠিন গানগুলো সহজেই বুঝতে পারবে। কিন্তু যে বাচ্চাটি ছোটকাল থেকেই গান বলতে কিছু শোনেনি, তার জন্যে গানের মর্ম উপলব্ধি করা তো দূরের কথা, সুর বোঝাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তেমন। তবে এমনও কিছু মানুষ আছে, জন্ম থেকেই যাদের কান নেই। ফলে তারা গান শুনতে পায় না। তাই এমনটাও হতে পারে যে, ধর্মের বাণী শোনার ক্ষেত্রেও কিছু লোক নিজেকে পুরোপুরি বধির বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু বেশিরভাগ জনতার ধর্মের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস**একদিকে মানুষকে সালাতের দাওয়াত দেয়, অপরদিকে হুদুদ-কিসাস-হিজাব ইত্যাদিকে সেকেলে বিধান মনে করে। তারা চায়, যেন আল্লাহও খুশি থাকে, আর শয়তানও নারাজ না হয়।(অনুবাদক)**করার বিষয়টি নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর। যেমনটা নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :বক্তব্যের সারকথা অনুযায়ী, হাদীসে বর্ণিত 'বাবা-মা' শব্দ দুটোকে একটু বিস্তর পরিসরে ব্যবহার করা যায়। যেমন : পারিবারিক জীবন, স্কুল, সমাজ ইত্যাদি–যেসব মাধ্যম দিয়ে শিশুর প্রাথমিক বিকাশ ঘটে আরকি। এটা অস্বীকার করার জো নেই, (নৈতিক) অবক্ষয়ের এই যুগে অনেক মুসলিম পরিবারেই দ্বীনচর্চার অবস্থা খুব বেগতিক। আর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও তাদের অধঃপতন ঘটেছে। তাই উঠতি বয়সীদের দ্বীন-বিমুখতার প্রথম উদ্দীপক হিসেবে কাজ করছে তার পরিবার। সর্বদা এটা নাও হতে পারে। কিন্তু মুসলিম সন্তানদের পশ্চিমা ভাবধারায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে, ভবিষৎ জীবনে তার মধ্যে অবশ্যই ধর্ম-বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ পাবে।এখন আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় : আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলিমদের আপত্তি জানানোর দ্বারা আদৌ এটা বোঝায় না, ইসলাম এই ধরনের (জাগতিক) শিক্ষার বিরোধী। এর পক্ষে ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই। পুরো কুরআন জুড়ে আছে জ্ঞানার্জনের উপদেশ। (কুরআনের নানান জায়গায় বলা হয়েছে)–"যাতেকরে তোমরা জ্ঞানবান হতে পারো,"যাতেতোমরা চিন্তা-ভাবনা

করো”,“যাতে করে তোমরা জানতে পারো” ইত্যাদি। এই মহিমান্বিত কিতাবেরশুরুর দিকে বলা হয়েছে :وَعَلَّمَآدَمَالْأَسْمَاءَكُلَّهَا“আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন।” [সূরাবাকারাহ, ২ : ৩১]এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মানুষকে ওইসব নাম শেখানোর কারণে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ ফেরেশতাদের চাইতেও মর্যাদাবান।[২] এখানে ‘নাম' দ্বারা বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ও অস্থিমজ্জাগত চিন্তাশক্তিকে রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে। চিন্তাশক্তি হলো মানুষের অনন্য ক্ষমতা। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ আল্লাহ তাআলার খলিফা হতে পেরেছে। এটাই কুরআনের বর্ণনা। আর এই চিন্তাশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্যে মানুষের ওপর জ্ঞানার্জনকে আবশ্যক করা হয়েছে। সেজন্যে নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : “ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্যে ফরজ।” [ইবনু মাজাহ, ২২৪]মহান তিনি আরও বলেছেন : “যদি কেউ ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন।” [সহীহ মুসলিম, ২৬৯৯]অন্যত্র তিনি আরও বলেন : “একজন আবিদের ওপর একজন আলিমের মর্যাদা এমন, পূর্ণিমারাতে চাঁদের উজ্জ্বলতা সব তারকারাজির ওপর যেমন।” [মুসনাদে আহমদ, ২১২০৮; তিরমিযি, ২৬৮২; আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, ২২৩; সুনান আদ-দারিমি, ৩৫৪]জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, তার জন্যে কুরআনের আয়াত এবং নবিজির হাদীস টেনে আনার দরকার নেই। কোনো প্রকার সংকোচ ছাড়াই ইতিহাস এটা সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামের মতো অন্য কোনো ধর্মই বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ব্যাপারে এতটা উৎসাহ দেয়নি। জ্ঞানার্জন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলাম-যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তার গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন আমরা পাই উমাইয়্যা ও আব্বাসী খিলাফতের আমলে। এবং স্পেন ও সিসিলিতে আরবদের শাসন চলাকালে। আমি এগুলো বড়াই করার জন্যে বলছি না। ইসলামি বিশ্ব আজ তার ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছে। রুহানি দিক থেকে হারিয়ে গিয়েছে অন্ধকারে। ডুবে আছে বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতায়। অধঃপনের এই যুগে গৌরবময় অতীত নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলা আমাদের সাজে না। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ইসলামি অনুশাসন এর জন্যে এক চুলও দায়ী নয়। এটা মুসলিমদের গাফিলতির ফসল।জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং উন্নয়নের পথে ইসলাম কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে এতটাই মর্যাদা দিয়েছে যে, (এই জ্ঞানের কারণে) মানুষ ফেরেশতাদের চাইতেও উঁচু মাকাম পেয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো ধর্মই জ্ঞানচর্চার প্রতি এতটা গুরুত্ব দেয়নি। আমরা যদি এই দ্বীনের মূলনীতি মেনে চলি, তবে কখনোই আধুনিক শিক্ষাকে আমাদের জীবন থেকে বাদ দেওয়ার কথা কল্পনা করতে পারব না। পশ্চিমা দেশগুলোর মতো বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে, আমাদের মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানচর্চা এবং উন্নতির ইচ্ছে থাকতে হবে। তবে, পশ্চিমাদের চশমা দিয়ে দেখা ওপশ্চিমা ভাবধারার আলোকে চিন্তা করার আগ্রহ মুসলিমদের মধ্যে বিলকুল সভ্যতাকে বস্তুবাদী, পুঁজিবাদী কিংবা মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা দিয়ে বদলানো থাকা যাবে না। ঈমান টিকিয়ে রাখতে চাইলে, ইসলামের আখিরাতমুখীযাবে না।জ্ঞান পূর্ব-পশ্চিমের ব্যক্তিগত (সম্পত্তি) নয়। এটা প্রকৃতির মতো সার্বজনীন। একটি বিষয়কে কিভাবে দেখা হবে এবং কিভাবে উপস্থাপন করা হবে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে জাতির কৃষ্টি-কালচারের ওপর। জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান কিংবা উদ্ভিদবিজ্ঞান লক্ষ্যের দিক থেকে না-বস্তুবাদী আর না-আখিরাতমুখী। এসবের মূল কাজ হলো বিষয়-বস্তুকে পর্যবেক্ষণ এবং সংকলন করা। এর মাধ্যমে নিয়মকানুন বের করে আনা। এসব বিদ্যা থেকে যে-দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়, তাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক দর্শন। এসব দর্শনের প্রস্তাবনা স্রেফ তত্ত্ব এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দেওয়া হয় না। জীবন এবং জীবন-সমস্যার ব্যাপারে পূর্ব-নির্ধারিত মানসিকতা এবং সহজাত প্রবৃত্তি এসব সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট বলেছিলেন : “এটা আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের চিন্তাশক্তি প্রকৃতি থেকে উপসংহার টানে না, বরং উপসংহার ঠিক করে দেয়।”সংক্ষেপে বলা যায়, এসব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিই হলো মুখ্য বিষয়। বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে, এটাই আমাদের চিন্তাশক্তিকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞান আমাদেরকে মহাবিশ্বের ভুলভাল ব্যাখ্যা দিতে প্ররোচিত করতে পারে না। বিজ্ঞান আসলে বস্তুবাদী কিংবা পরকালমুখীকোনো বিষয় নয়। মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা আখিরাতমুখী হবে নাকি দুনিয়ামুখী, সেটা নির্ভর করে আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর। প্রাশ্চাত্যের উঁচু তরকার পরিশালিত বুদ্ধিবৃত্তি অনেক আগ থেকেই বস্তুবাদ দ্বারা প্রভাবিত। এর মৌলিক চিন্তাধারা ষোলো আনাই ধর্ম-বিদ্বেষী। ওদের শিক্ষাব্যবস্থাও যে পুরোপুরি ধর্ম-বিন্নী ধরতে হবে, এটাই তো স্বাভাবিক।অপরদিকে,গবেষণাধর্মী আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা, ইসলামের সাংস্কৃতিক

মূল্যবোধের জন্যে দূষণীয় নয়। বরং বিশ্রামের শিক্ষাগতী হওয়ার জন্যে মুসলিমরা পশ্চিম সভ্যতার যে-প্রাণশক্তিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, সেটা বিপজ্জনক।দুঃখের বিষয় হলো, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বহুকাল ধরে আমরা দু অবস্থান করছি। আমাদের উদাসীনতা ও গাফিলতি–আমাদেরকে পুরোপুরি পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জ্ঞান অর্জন করার ওপর ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামের এই মূলনীতি অনুসরণ করলে, আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমাদেরকে পাশ্চাত্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো না। মরুভূমিতে তৃষ্ণায় ছটফট করা ব্যক্তি পানির জন্যে যেমন মরীচিকার পানে তাকিয়ে থাকে, আমরাও ঠিক তেমন করে ইউরোপের দিকে তাকিয়ে আছি)। মুসলিমরা দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের সম্ভাবনাকে হেলায়-ফেলায় নষ্ট করেছে। ফলে আজ তারা দরিদ্রতা ও অজ্ঞতার কষাঘাতে পিষ্ট। অপরদিকে ইউরোপ খুব দ্রুত গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।এই শূন্যতা পূরণ হতে অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণ পর্যন্ত নেহায়েত বাধ্য হয়েই পশ্চিমাদের শিক্ষা-বিষয়ক উপকরণ ব্যবহার করে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। এর জন্যে অবশ্য কৃতজ্ঞও থাকতে হবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না–আমরা কেবল ওদের বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু এবং কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকব। এর বেশি আগাতে যাব না। অন্যভাবে বলতে গেলে, পশ্চিমাদের তরতিব অনুযায়ী প্রকৃত বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। এক্ষেত্রে যুবকদের গড়িমসি করাটা উচিত হবে না। কিন্তু মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থায় কখনোই তাদের 'দর্শনকে' ঠাই দেওয়া যাবে না।কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন : আজ তো প্রকৃত বিজ্ঞানের অনেকবিষয়ই গবেষণার পথ পাড়ি দিয়ে চলে গিয়েছে দার্শনিক পর্যায়ে। এই যেমন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর কথাই ধরুনা আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গবেষণামূলক বিজ্ঞান এবং কল্পনাবিলাসী দশন আলাদা করা বেশ কঠিন হয়েপড়ে। (এই অবস্থায় আমরা কী করব?)হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যদিক থেকেও চিন্তা করা যায়। ঠিক এইখানে এসেই ইসলামি সংস্কৃতি নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবেন, তখন পাশ্চাত্যের দার্শনিক তত্ত্বগুলোকে ঠেলে দেবেন একপাশে। নিজেদের চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়ে তা বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। এটা তাদের দায়িত্ব। 'ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির' বদৌলতে হয়তো তারা কোনো উপসংহারে পৌঁছতে পারবেন। হতে পারে সেটা পাশ্চাত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের চাইতে ভিন্নকিছু।ভবিষ্যতে যা হয় হোক। পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মাথা বন্ধক না রেখে, বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষাদান জারি রাখা সম্ভব। ইসলামি দুনিয়ার জন্যে নিত্যনতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জরুরত নেই। প্রয়োজন শুধু অত্যাধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির শিক্ষা এবং রুহানি উপকরণের।ইসলামকে শতভাগ গুরুত্ব দেয়, এমন একটি আদর্শ শিক্ষাবোর্ডকে সিলেবাস প্রস্তাব করতে গিয়ে আমি বলব : পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের মধ্য থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর গণিত যেন মুসলিমদের স্কুলগুলোতে শেখানো হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বেলায় উল্লিখিত আপত্তিও আমলে রাখতে বলব। আর বর্তমান কারিকুলামে ইউরোপের দর্শন, সাহিত্য এবং ইতিহাস- চর্চার যে প্রাধান্য রয়েছে, সেটা বাদ দিতে হবে।ইউরোপীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, সেটা আগেই খোলসা করেছি। তবে ইউরোপীয় সাহিত্যের ব্যাপারে আমাদের অত বেশি উৎসুক হলে চলবে না। এটাকে দেখতে হবে নিতান্তই ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আজকাল মুসলিম দেশগুলোতে যেভাবে এসব পড়ানো হয়, সেটাকে একপাক্ষিক শিক্ষা বলা চলে। পাশ্চাত্যের মূল্যবোধও ধ্যানধারণার অতিরঞ্জনের ফলে যুবক-যুবতীওঅপরিপক্ক মন-মগজ,পশ্চিমা সভ্যতার সঞ্জীবনী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তারা খুব কমই এর নেতিবাচক দিকগুলো উপলব্ধি করতে পারে। এর ফলে শুধু-যে পশ্চিমা মূল্যবোধকে অন্ধভাবে পূজা করার মানসিকতা তৈরি হয়, তা না। ওসব মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা হয়। এটা কখনোই ইসলামি মূল্যবোধের সাথে মানানসই হতে পারে না। তাই মুসলিম স্কুলগুলোতে প্রভাব বিস্তারকারী ইউরোপীয় সাহিত্যেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে। সেখানে নিয়ে আসতে হবে ইসলামি সাহিত্য। যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সংস্কৃতির গভীরতা ও প্রাচুর্য দেখে উজ্জীবিত হয়। এই চিন্তা-চেতনা প্রবেশ করাতে পারলে, ইসলামি সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে।মুসলিমদের অনেক প্রতিষ্ঠানেই আজ ইউরোপীয় সাহিত্য দাদাগিরি করে বেড়াচ্ছে। এর ফলে মুসলিম তরুণরা ইসলাম-বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর ইতিহাসকে ব্যাখা করার ব্যাপারটিও সমানতালে দায়ী–এটাও মনে রাখতে হবে। তাদের লেখনীতে 'রোমান বনাম বর্বর' দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। এই পৃথিবীতে যা কিছু ছিল এবং যা

কিছু সামনে আসবে, সকল কিছুর চাইতে পশ্চিমা জাতি এবং সভ্যতা শ্রেষ্ঠ—এটা প্রমাণ করার লক্ষ্য নিয়েই তারা ইতিহাস বয়ান করে থাকে। অবশ্য তারা তাদের এই ধরনের মতিগতি স্বীকার করতে চায় না। ইতিহাসকে এভাবে পেশ করার মাধ্যমে, গোটা বিশ্বের ওপর পশ্চিমাদের শাসন চালানোকে একপ্রকার নৈতিক বৈধতা দেওয়া হয় ।ইউরোপের দেশগুলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার বিবাদকে নিজেদের আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত। রোমানদের সময় থেকেই এটা চলে আসছে। মানবজাতি কতখানি অগ্রসর হয়েছে, সেটা বিচার করতে হবে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির আদলে। তারা তাদের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চায়। এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি (ইতিহাসের) একটি বিকৃত রূপ তুলে ধরে। ইউরোপীয় আদর্শকে দূরে রেখে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, ঐতিহাসিক সমস্যাগুলোর যে বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে, তা হজমকরাটা পশ্চিমাদের জন্যে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় ।পাশ্চাত্যের এই অহংকারী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, আজ অবধি তাদের বর্ণিত পৃথিবীর ইতিহাস আসলে ইউরোপেরঅতিরঞ্জিত ইতিহাস ছাড়া কিছুই আমেরিকাকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। স্রেফ এ জন্যেই তাদেরকে নয়। পাশ্চাত্যের বাইরের দেশগুলোর জীবনযাত্রা ও ক্রমবিকাশ ইউরোপ- আলোচনায় আনা হয়। আপনি যদি পশ্চিমাদের ইতিহাসকে খুঁটিয়ে খুটিয়ে বর্ণনা করেন, আর পৃথিবীর বাদবাকি অংশকে কেবল একপলক দেখিয়ে যান, তবে তো পাঠক বিভ্রান্ত হবেই। সে ভাববে, পশ্চিমাদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন গোটা দুনিয়ার চাইতে সমৃদ্ধ। পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্যেই বোধহয় পৃথিবীটার জন্ম হয়েছে। বাদবাকি সকল সভ্যতাকে থরেথরে সাজানো হয়েছে পশ্চিমাদের গুণগান করার জন্যে ।ইতিহাসকে এই আঙ্গিকে উপস্থাপন করার ফলে, অ-ইউরোপীয় যুবকরা নিজেদের সংস্কৃতি, পূর্ববর্তীদের ইতিহাস এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। সুকৌশলে তাদেরকে এটাই শেখানো হয়েছে যে, পশ্চিমা আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আঁধারে মিলিয়ে যাবে ।এসব নেতিবাচক প্রভাব দূর করতে চাই পাল্টা পদক্ষেপ। প্রভাবশালী ইসলামি বুদ্ধিজীবীদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। মুসলিমদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতিহাসের সিলেবাস সংশোধন করার উদ্যোগ নিতে হবে। এটা যে গুরুদায়িত্ব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা ইতিহাসের ধারাকে ঢেলে সাজাতে পারব। নতুন করে পৃথিবীর ইতিহাস রচিত হওয়ার পূর্বেই, ইতিহাসকে দেখতে পারব মুসলিমদের আয়নায় ।বিষয়টি হয়তো কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। তা ছাড়া, এটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যথায় আমাদের তরুণ-প্রজন্ম পশ্চিমাদের ইসলাম-বিরোধী উপকরণ দ্বারা আক্রান্ত হতেই থাকবে। আর তাদের মধ্যে বাড়তে থাকবে হীনমন্যতার জটিলতা। মুসলিমরা যদি পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং জীবন থেকে ইসলামকে মুছে ফেলে, তবে এই জটিলতা কখনোই কাটবে না। তারা কি উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত নয়?আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিমাদের সমস্ত ধ্যানধারণার চাইতে ইসলামের রীতিনীতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধ, ইনসাফ এবং স্বাধীনতা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ। আসলে পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের এই বিশ্বাসকে আরও জোরালো করে তোলে। বর্ণবাদকে[৭৪] ইসলাম ঘৃণার চোখে দেখে। মানুষের সাম্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধকে বেশি জোর দেয় ।কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনো তার বর্ণবাদীএবং জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণমাদাসিকতা থেকে সরে আসতে পারেনি। ইসলামি সমাজে কখনো শ্রেণীগত বে-সংঘাত ঘটেনি। অথচ প্রাচীন গ্রিস ও রোম থেকে নিয়ে বর্তমান জমানা পর্যন্ত, পাশ্চাত্যের ইতিহাস শ্রেণী সংঘাত ও সামাজিক সহিংসতা দিয়েভরপুর ।বারবারআমাদেরকে এটার পুনরাবৃত্তি করতে হবে যে, পশ্চিমাদের কাছ থেকে স্রেফ একটি বিষয়ই মুসলমানদের শিখে নিতে হবে। তা হলো, নির্ভেজাল এবং প্রায়োগিক বিজ্ঞান। কিন্তু ওদের কাছ থেকে বিজ্ঞান শেখার প্রয়োজনীয়তা, একজন মুসলিমকে যেন ইসলামি সভ্যতার চাইতে পশ্চিমা সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে প্ররোচিত না করে। যদি সে প্রভাবিত হয় তবে বুঝতে হবে, ইসলামের হাকিকত সে বোঝেনি ।একটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব কখনো বৈজ্ঞানিক প্রাচুর্যের ওপর নির্ভর করে না। নৈতিকশক্তি এবং জীবনের নানান দৃশ্যপটকে বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করতে পারার সক্ষমতার ওপর এটা নির্ভরশীল। এটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে ইসলাম অন্যান্য সকল সভ্যতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। মানবজাতি উৎকর্ষতার যে সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছতে চায়, সেখানে যাওয়ার জন্যে অবশ্যই ইসলামের বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে। আমরা যদি ইসলামি মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই এবং এর পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখি, তবে অবশ্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ বাদ দিতে হবে। কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব ইসলামের যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে, তার

তুলনায় এটা থেকে প্রাপ্ত দুনিয়াবি ফায়দা তো কিছুই না।অতীতকালের মুসলিমরা যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে অবহেলা করতেনা"[৭৭],[৭৬] জাতীয়তাবাদ বলতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর আলাদা আলাদা আদর্শকে বোঝায়। একটি দেশ নির্ধারিত কোনো আদর্শকে সামনে রেখে, তার নাগরিকদের সেটার দিকে আহ্বান করে। সেই আদর্শকেই অন্যান্য সকল কিছুর চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এমনকি সেই আদর্শের জন্যে জীবন বাজি রাখতেও জনতাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। নিজ দেশের উন্নতির জন্যে যে-কোনো কাজ করা জাতীয়তাবাদী আদর্শ অনুসারে বৈধ। এমনকি সেটা অন্য রাষ্ট্রের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে হলেও। - (অনুবাদক)[৭৭] এখানে কথাটা উপমা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে। অতীকালের মুসলিম বিজ্ঞানীদের কীর্তিগাথাঅনুকরণ করতেন না। পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণের ক্ষতিকর। তবুও ভুল সংশোধনের আশায় বর্তমান জমানার মতো কখনোই পশ্চিমাদের প্রভাব পড়েছে মুসলিম-বিশ্বের চিন্তা-চেতনার ওপর।সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে, নীতিভ্রষ্ট পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই সভ্যতা চুপিসারে কেবল আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেই প্রবেশ করেনি, ঢুকে পড়েছে আমাদের সমাজ- কাঠামোতেও। মুসলিমরা আজ পশ্চিমাদের আচার-আচরণ ও জীবন-যাপন হুবহু নকল করছে। ফলে পাশ্চাত্যের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আস্তে আস্তে নিজেকে খাপ খাওয়াতে বাধ্য হচ্ছে। আসলে কোনো ধ্যানধারণার বাহ্যিক অনুসরণ ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, শেষমেশ ওই ধারণা অনুযায়ী আমরা গোটা বিশ্বকে দেখতে বাধ্য হই।

অনুকরণের বেড়াজাল

মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে ইসলামি সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, এবং রেনেসাঁর পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ। কয়েক দশক পূর্বে এই সাংস্কৃতিক ব্যাধি শুরু হয়। হ্যাঁ, একে ব্যাধিই বলতে হয়। পশ্চিমাদের দুনিয়াবি প্রতিপত্তি ও উন্নতির সাথে মুসলিমরা নিজেদের শোচনীয় সামাজিক অবস্থার তুলনা করে চলছিল। তাদের নৈরাশ্য থেকেই এটির উৎপত্তি। মুসলিমরা একদিকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে অবহেলা করতে শুরু করেছিল। এর সাথে যুক্ত হয় আলিম নামধারী কিছু লোকের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য এদের দায়টাই বেশি। এই দুই দলের কারণে এমন ধারণার জন্ম হয় যে, পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নয়তো মুসলিমরা কিছুতেই বাকি দুনিয়ার উন্নতির সাথে পাল্লা দিতে পারবে না।মুসলিম-বিশ্ব ছিল স্থবির অবস্থায়। আর অনেক মুসলিম এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত প্রগতির জন্যে উপযুক্ত নয়। তাই একে পাশ্চাত্যের আদলে সংস্কার করতে হবে। ওইসব 'পণ্ডিতরা' কখনো ভেবে দেখার চেষ্টা করেনি–মুসলিমদের শোচনীয় অবস্থার জন্যে ইসলামের শিক্ষা আসলে কতটুকু দায়ী। ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে তারা কখনো জানার চেষ্টা করেনি। কেবল সমসাময়িক আলিমদের মতামতকে দুনিয়াবি প্রগতি এবং বস্তুগত উন্নতির অন্তরায় মনে করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো তাদের দাবি যথার্থ ছিল। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর মতো মূল উৎসের দিকে নজর দেওয়ার বদলে, তারা চুপিসারে বাছাই করেছে ইসলামের আইনশাস্ত্র তথা শারীয়া এবং বর্তমান সময়ের জটিলতম ফিকাহকে। অথচ যুগ-সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়নি। ফলে শারীয়ার ওপর তারা বাস্তবিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। আর একে ঠাই দিয়েছে ইতিহাসের পাতায় ও জ্ঞানের তাত্ত্বিক জগতে। সে জন্যেই তারা মনে করে : মুসলিম-বিশ্বের অবক্ষয় ও পতন থেকে উত্তরণের একমাত্রউপায় হলো পশ্চিমাদের অনুকরণ।আদতে এটা ছিল পথভ্রষ্টতা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ধরে এসব পণ্ডিতদের পক্ষে সাফাই গেয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লেখা হয়। সেগুলো ছিল অত্যন্ত নিম্ন মানের। এসব প্রবন্ধে অবশ্য ইসলামের বাস্তব শিক্ষাকে খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করা হয়নি। তবে এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে, ইসলামের আদর্শ পশ্চিমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারণার অনুগামী হতে পারে। এভাবেই মুসলিমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণের পক্ষে উকালতি করতে থাকে। যার ফলে ইসলামের অত্যাবশ্যক সামাজিক মূলনীতিগুলো ধীরে ধীরে মুছে যেতে শুরু করে। আর এর নাম দেওয়া হয় 'প্রগতি'। একেই আজকালকার মুসলিম দেশগুলোর ক্রমবিকাশের প্রতীক মনে করা হয়।তথাকথিত

কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী বলে থাকে : আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো জীবন-যাপন করব। মনোমতো কাপড় গায়ে দেব। চাই সেটা পাশ্চাত্যের আদলে হোক বা আমাদের সালাফদের মতো। তাতে কী আসে যায়! রীতিনীতির ক্ষেত্রে আমরা রক্ষণশীল হতেও পারি, নাও হতে পারি। এগুলো আমাদের আধ্যাত্মিকতার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। এই ধরনের যুক্তিতর্ক আসলে বিপথগামীদের কাজ-কারবার। কোনো ধরনের সংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনার স্থান ইসলামে নেই।" ইসলাম মানুষের জন্যে সম্ভাবনার এক বিশাল দুয়ার খুলে রাখে। এই দুয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত খোলা, যতক্ষণ না দ্বীনের কোনো বিধান লঙ্ঘন হচ্ছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রশ্চিমা সমাজ-কাঠামোর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক ইসলামি শিক্ষার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক । যেমনঃ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে পুঁজির ওপর সুদ ধার্য করা ইত্যাদি। [৭৯] মানুষেরধর্মীয় আবেগ, পশ্চিমা সভ্যতা ব্যহত করে। এটা তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আমি তা পূর্বেই দেখানোর চেষ্টা করেছি। কেবল নাদান ব্যক্তিরাই বলতে পারে : "কোনো সভ্যতার চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, শুধু ওপরে ওপরে তাকে অনুসরণ করা যায়।" সভ্যতা কোনো ঘোড়ার ডিম নয়। এর প্রাণ আছে। যখনি আমরা তার বাহ্যিক কোনো অংশের অনুসরণ করব, এর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও চলমান প্রভাব আমাদের ওপর কাজ করতে শুরু করবে। ধীরে ধীরে পুরো চিন্তার জগৎকে সে দখল করে নেবে। নবিজির হাদীসের মাধ্যমে ব্যাপারটির আরও স্পষ্ট হয় : "যে ব্যক্তি কোনো কওমকে অনুকরণ করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত।" [মুসনাদে আহমাদ, ২/৫০; আবুদাউদ, ৪০৩১]এই পরিচিত হাদিসটি কেবল মৃদু ধমকিই নয়, বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার পদক্ষেপও বটে। মুসলিমরা বাহ্যিকভাবে কোনো অমুসলিম সভ্যতার অনুসরণ করতে থাকলে, একসময় তাদের মতোই হয়ে যাবে। এই অনিবার্য বাস্তবতা হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টি সামনে রেখে বলা যায়, 'গুরুত্বপূর্ণ' ও 'গুরুত্বহীন' দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে সামাজিক জীবনে কোনো মৌলিক তফাতনেই। এদিক থেকে বললে, আসলেযেমন পোশাকের কথাই ধরুন।কোনো জিনিসই 'গুরুত্বহীন' নয়। এই "পোশাক বাহ্যিক উপকরণ। একজন ব্যক্তির এর কোনো প্রভাব নেই"এই ধারণাআধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি গলদ। পোশাক হলো বহুকাল ধরে চলে আসা মানুষের অভিরুচি এবং চাহিদার বহিঃপ্রকাশ। পোশাকের ধরন মানুষের নান্দনিকতার পরিচয় বহন করে। মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও মন-মননের ভিত্তিতে পোশাকের ধরন বদলাতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমাদের নিত্যনতুন ফ্যাশন তাদেরবুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক চরিত্রের নিদর্শন।একজন মুসলিম নিজের পোশাক-আশাক ছেড়ে পাশ্চাত্যের ফ্যাশন নকল করার মাধ্যমে নিজের অজান্তেই ওদের অভিরুচি গ্রহণ করে নিচ্ছে। আর নিজের নীতি-নৈতিকতা ও চিন্তা-চেতনাকে এমনভাবে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলছে, যেন তা নতুন পোশাকের সাথে খাপ খায়। এভাবেই সে তার আপন মানুষদের সাথে সাংস্কৃতিক লেনাদেনা চুকিয়ে ফেলছে। তাদের ঐতিহ্যবাহী রুচিবোধ, নান্দনিকতা, ভালোলাগা ও মন্দলাগার বিষয়কে পরিত্যাগ করছে। আর চিন্তা-চেতনা ও নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে গোলামি করছে ফিরিঙ্গি সভ্যতার। ব্যাপারটিকে অন্যভাবেও বলা যায়। একজন মুসলিম যদি পশ্চিমাদের পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ ও জীবন-যাপনকে অনুসরণ করতে থাকে, সে যেন তার সভ্যতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে মুনাফিকি করল। সে যদি প্রকাশ্যে তার সভ্যতাকে সত্য বলে স্বীকার করেও থাকে, তবুও। ভিনদেশী সভ্যতার মৌলিক রীতিনীতি গ্রহণ না করে একে অনুসরণ করাটা, বাস্তবে সম্ভব নয়। তেমনিভাবে, একটি ধর্ম-বিদ্বেষী সভ্যতার রীতিনীতি অনুসরণ করে নিজেকে ভালো মুসলিম দাবি করাটাও সমানতালে অসম্ভব।মূলতহীনমন্যতার কারণেই ফিরিঙ্গি সভ্যতার অনুকরণের প্রতি ঝোঁক তৈরি কারণ। পশ্চিমাদের ক্ষমতার দাপট, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও ধবধবে চেহারার হয়। যেসব মুসলিমরা পশ্চিমাদের অনুসরণ করে, তার পেছনেও এটাই সাথে তারা দুর্দশাগ্রস্ত ইসলামি বিশ্বের তুলনা করে। আর বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, এই জমানায় পশ্চিমাদের দেখানো পথ ছাড়া (উন্নতির) আর কোনো রাস্তা নেই। নিজেদের অক্ষমতার জন্যে ইসলামকে দায়ী করাটা আজ আমাদের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কৈফিয়ত দিতে বড্ড পটু। তারা নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে বোঝাতে থাকেন : পশ্চিমা মূল্যবোধের সাথে মানিয়ে চলাটা ইসলাম-বিরোধী কোনোকাজ না।মুসলিম-বিশ্বের পুনর্জাগরণের জন্যে কোনো ধরনের বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে, নিজেদের দ্বীন ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে কাঁচুমাচু করার মানসিকতা একদম ঝেড়ে ফেলতে হবে। মুসলিমকে অবশ্যই মাথা উঁচু বাঁচতে শিখতে হবে। তাকে বুঝতে হবে, পুরো দুনিয়ার চেয়ে সে আলাদা। তার উচিত এই স্বকীয়তা নিয়ে গর্ব অনুভব করা। অন্ধের যষ্ঠি মনে করে একে আগলে রাখতে হবে। এই ব্যাপারে

কোনো প্রকার দোনোমনো করা চলবে না। অন্য কোনো সংস্কৃতির সাথে না গুলিয়ে, একে বীরের মতো তুলে ধরতে হবে বিশ্ববাসীর সামনে।তার মানে এই না যে, মুসলিমরা নিজেদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে রাখবে। নতুন নতুন ইতিবাচক গুণগুলো অন্যান্য সভ্যতা থেকে গ্রহণ করা যায়। তবে কোনোমতেই নিজের সংস্কৃতি ছাড়া যাবে না। এর একটি উদাহরণ হতে পারে ইউরোপীয় রেনেসাঁস। সেখানে আমরা দেখতে পাই, আরবদের জ্ঞানচর্চার উপকরণ ও পদ্ধতি ইউরোপ অনায়াসে গ্রহণ করেছে। কিন্তু আরবদের বেশভূষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা কখনোই অনুসরণ করেনি। নিজেদের নান্দনিকতা ও চিন্তার স্বাধীনতাকে বলি দেয়নি একটুও। আরবদের প্রভাবকে তারা শুধু নিজেদের ভূমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করেছিল যেভাবে আরবরা একসময় কাজে লাগিয়েছিল হেলেনিস্টিক প্রভাবকে। যার ফলে, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী ছিল। আত্মমর্যাদা ও অতীত (গৌরবের) সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ছাড়া সভ্যতার উত্থান দেখতে পাই। যারা আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদায় বলীয়ান কোনো সভ্যতাই উন্নতি করতে পারে না। এমনকি অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখতেপারে না।পাশ্চাত্যের অনুকরণ এবং এর ভাবাদর্শকে আপন করে নেওয়ার ফলে, ইসলামি বিশ্ব তার অতীত থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। যারা ফলে তার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার মূলে পচন ধরতে শুরু করেছে। তার অবস্থা যেন ওই গাছের মতন, যার শেকড় মাটির গভীরে থাকা অবস্থায় সে জোরদার ছিল। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার পাহাড়ি জলস্রোত এসে শেকড়কে আলগা করে দিয়েছে। ফলে পুষ্টির অভাবে ধীরে ধীরে গাছটি নেতিয়ে পড়ছে। এক-এক করে ঝরে পড়ছে তার পত্রগুচ্ছ। ডালপালা শুষ্ক হয়ে আসছে। দিনশেষে এর গুড়ি উপড়ে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।মুসলিম-বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্যে পশ্চিমাদের অনুকরণ কখনোই সঠিক পন্থা হতে পারে না। (এই জড়তার) কারণ হচ্ছে, বাস্তবধর্মী একটি দ্বীনকে নিছক প্রাণহীন কিছু রীতিনীতিতে পরিণত করা। এবং নীতি-নৈতিকতা ও জীবনের আঙিনা থেকে একে মুছে ফেলা। তাহলে আজকের মুসলিমরা যে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণশক্তির অভাব বোধ করছে, এর (সমাধানের) জন্যে তাদের কোথায় তাকানো উচিত? এর উত্তর প্রশ্নের মতোই সোজাসাপ্টা। অবশ্য উত্তরটা লুকিয়ে আছে প্রশ্নের মধ্যেই। ইতিপূর্বে বহুবার এটা বলেছি, ইসলাম স্রেফ 'অন্তরের বিশ্বাসের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের জন্যে বাতলে দেওয়া একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই যে-সভ্যতার মূল্যবোধের মাপকাঠি ভিন্ন, এমন কারও সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেললে, এটি আপনাআপনিই ধসে পড়বে। যখনি একে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা হবে, আর ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে একে প্রাধান্য দেওয়া হবে, তখনি এরপুনরুত্থান ঘটবে। বর্তমান জমানাতে নিত্যনতুনধ্যানধারণা ও ভাবাদর্শ একেঅপরের সাথে টক্কর দিচ্ছে। তাই ইসলাম স্রেফ নামকাওয়াস্তে কোনো ধর্ম হয়ে থাকতে পারে না। তার বহু শতাব্দীর ঘুমের মায়াজাল কেটে গিয়েছে। এখন শুরু হয়েছে বাঁচা-মরার লড়াই। মুসলিমরাআজ যে-সমস্যার সম্মুখীন, তার সাথে তুলনা দেওয়া যায় একজন মুসাফিরের। সফর করতে করতে সে এমন এক রাস্তায় এসে পৌঁছেছে, যেটা আড়াআড়িভাবে দুইদিকে চলে গিয়েছে। চাইলে সে ওখানটাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এর ফলাফল হলো অনাহারে ধুকেধুকে মৃত্যু। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে যে-পথ চলে গিয়েছে, সেটা ধরেও সে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে তাকে তার অতীত জীবনটাকে চিরকালের জন্যে বিদায় জানাতে হবে। অপর পথটি চলে গিয়েছে সত্যিকার ইসলামের দিকে। সে চাইলে এটিও বেছে নিতে পারে। কিন্তু এই পথ শুধু তাদেরকেই আহ্বান করে, যারা নিজেদের অতীতে বিশ্বাসী। পাশাপাশি সেই অতীতকেসম্ভাবনাময় ভবিষ্যতে রূপান্তর করতে চায়।

পতন পরিক্রমা ঃ

আজকের মুসলমানরা যে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহে বসবাস করছে, আবহকে এমনি এমনি বোঝা যাবে না। একে বুঝতে গেলে আগে আমাদের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সামসময়িক ঘটনা বুঝে নিতে হবে। এই ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতাতেই বিশ্ব এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উপনীত হয়েছে। সংঘটিত হয়েছে রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং সামাজিক বিবর্তনও। আমরা সবাই জানি, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা মূলত খ্রিষ্টবাদী সমাজ ও গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। মুসলমান সমাজ নিজেদের যতই স্বাধীন বলে মনে করুক না কেন, তারাও প্রকারান্তরে ওই খ্রিষ্টবাদী সমাজ কর্তৃক প্রভাবিত। এ প্রভাব থেকে বের হয়ে এসে নিজেদের স্বকীয় ও স্বাধীন কর্মনীতি অবলম্বনের আপাত কোনো সম্ভাবনা মুসলিমদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না । আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে চাইলে, বর্তমান মুসলিম সমাজ পশ্চিমা খ্রিষ্টবাদী সমাজের চিন্তা ও দর্শনের কাছে পুরোপুরি বাঁধা পড়ে গেছে।এটা একধরনের আদর্শিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব। কিন্তু এই দাসত্ব থেকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত মুসলিম জাতি ও দেশসমূহের নীতি বা কর্মপদ্ধতির মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তবে তার মানে এই নয়, তারা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির কোনো চেষ্টাই করছে না । বিগত ৪০০ বা ৫০০ বছর ধরে বিশ্বের বহু দেশে নাম জানা, না জানা বহু মুসলিম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীই এ লক্ষ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিছেন। এমনকি কেউ কেউ এ লক্ষ্যে তাদের জীবন, সম্পদসহ সর্বস্ব বিলিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এখনও পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান সফলতা ধরা দেয়নি। তাই চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়াও সম্ভব হয়নি মুসলিম উম্মাহর। বিগত প্রায় ১০০ বছর ধরে অনেক মুসলিম দেশই উপনিবেশবাদের ছোবল থেকে রাজনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এ কথা সত্য। কিন্তু এই স্বাধীনতা দিনশেষে তাদের জীবনে অর্থবহ কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ? চিন্তার দাসত্ব। এই চিন্তার দাসত্ব কোন পথে, কীভাবে মুসলিম মানসে প্রবেশ করেছে?আর তার পরিণামই-বা কী হয়েছে?আজ এই প্রশ্নটা করা খুবই প্রয়োজন। প্রয়োজন দাঁড় করিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা করা–আমরাও কি মস্তিষ্কেনিজেকে বিবেকের আয়নায় এই দাসত্ব ধারণ করেআছি?আজও কি বয়ে চলেছি সাম্রাজ্যবাদের বিষ? এর পাশাপাশি কোন পথে এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, সেটাও জানা প্রয়োজন। আর তা জানতে হলে ইতঃপূর্বে নানা যুগে আমাদের যেসব মুসলিম মনীষী চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তির চেষ্টা করেছেন, সেগুলো জানতে হবে। আবার তাদের সে চেষ্টা কেনই-বা ব্যর্থ হয়েছে, সে বিষয়েও আমাদের সম্যকধারণা থাকা প্রয়োজন।এই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হলে সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার অন্দর-বাইর। কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শের ওপরে এই বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক কী, নিয়েও ধারণা রাখতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের পরবর্তী আলোচনা পরিচালিত হবে। অনেক বড়ো পরিসরে সম্ভব না হলেও এ গ্রন্থে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। প্রথম প্রশ্ন হলো, মুসলিমদের ঐক্যের জায়গায় আঘাতের শুরুটা কীভাবে হয়েছে? উত্তর হলো, চিন্তার জগতের নৈরাজ্যই মূলত অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে ধসিয়ে দিয়েছে। এই নৈরাজ্যের সূচনাটা হয়েছিল খিলাফতের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে। তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পরে ৩৭ হিজরিতে আলি (রা.) চতুর্থ খলিফা হিসেবে ক্ষমতা নেন। তাঁর নির্বাচন ও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াকে কেন্দ্র করে পুরো মুসলমান সমাজ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের একটি দল আলি (রা.)-কে সমর্থন করলেও অপর দলটি সম্মানিত সাহাবি মুয়াবিয়া (রা.)-কে সমর্থন করেন। এই দুই সম্মানিত সাহাবির মধ্যে কে প্রকৃতার্থে খলিফা কিংবা কার খিলাফত বৈধ–এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে পুরো মুসলিম উম্মাহ একটি ভয়ানক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আর তারই সূত্র ধরে ৬৫৭ সালের জুলাই মাসে সূচনা হয় সিফফিনের যুদ্ধের। যুদ্ধটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত একটি ঘটনা। বিশেষ করে তখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে গড়া লক্ষাধিক সাহাবি জীবিত ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই এই যুদ্ধের ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়েন। সিনিয়র সাহাবিগণ ভ্রাতৃঘাতী এ যুদ্ধ বন্ধে তৎপর হন। তারা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি সালিশি কমিটি গঠন করেন। এজন্য দুজন বিচারক নির্ধারণ করে যে সিদ্ধান্ত দেবেন, বিবদমান পক্ষগুলো সেগুলো মেনে নেবেন। তাঁদের ওপরে দায়িত্ব দেন। সিদ্ধান্ত হয়, তাঁরা দুজনে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে এরই সূত্র ধরে একসময় আলি ও মুয়াবিয়া (রা.) - এই দুই সম্মানিত সাহাবির

মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক সমঝোতা হয়। এ সময় আলি (রা.)-এর দল থেকে কয়েক হাজার সৈন্য বিদ্রোহ করে দল ত্যাগ করে। তাদের অভিযোগ ছিল, খলিফা আলি (রা.) কাফির হয়ে গেছেন! তাঁর ঈমান চলে গেছে। কেননা, তিনি সূরা হুজুরাতের ৯ নং আয়াতের নির্দেশনাটি মানেননি । সেই আয়াতে বলা আছে–মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একদল যদি সীমালঙ্ঘন করে, সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; যতক্ষণ তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না আসে।' মুয়াবিয়া (রা.)-এর দল যেহেতু সীমালঙ্ঘনকারী, তাই তারা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আলি (রা.) তা না করে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করার মাধ্যমে সূরা হুজুরাতের উক্ত আয়াতটির স্পষ্ট লঙ্ঘন করেছেন। ফলে তিনি কাফির হয়ে গেছেন। একদিন আলি (রা.) কুফার একটি মসজিদে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় মসজিদের এক কোনায় 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ' বা 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া আরও হুকুম মানি না' স্লোগান দিয়ে হট্টগোল করা হয়।মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে বিরোধের নিষ্পত্তিকল্পে গঠিত সালিশি কমিটির দিকে ইঙ্গিত করে তারা আলি (রা.)-কে উদ্দেশ করে বলে, আপনি বিচারব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন! অথচ বিচারের মালিক স্বয়ং আল্লাহ। তারা তাদের দাবির সপক্ষে সূরা আনআমের ৫৭ নং আয়াত অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত কারও ফয়সালা গ্রহণযোগ্য নয়'-এর উদ্ধৃতি দেয়। তারপর দাবি করে, আলি (রা.) আল্লাহর হুকুম ভঙ্গ করেছেন। আর আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের কারণে তিনি মুরতাদ হয়ে গেছেন ! যেহেতু কাফিরের আনুগত্য করা জায়েজ নেই, তাই যে বা যারা আলি (রা.)-বে কাফির মানবে না, তারাও কাফির। তাদের এই হিসেবে সকল সাহাবি কাফি ও মুরতাদ হয়ে গেছে! এই দলটি ইতিহাসে খারেজি হিসেবে পরিচিত। খারেজি শব্দের অর্থ বের যাওয়া বা বহিষ্কৃত। এই দলটি সর্বপ্রথম একটি বৈধ খিলাফত অস্বীকার করে। মুসলিম উম্মাহর মূল অংশ থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর মদিনার অদূরে হারুরা প্রান্তরে আলাদা বসতি স্থাপন করে। এর মধ্য দিয়ে তারা একটি ইসলামি রাষ্ট্রেরমধ্যে আলাদা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে ফেলে । এ সময় সকল সচেতন মহল থেকে তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এ লক্ষ্যে আলি (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে তাদের নিকট পাঠান। তাঁর প্রচেষ্টা একেবারে বিফলে যায়নি। দীর্ঘ আলোচনার পর খারেজিদের একটা অংশ সঠিক পথে ফিরে এলেও অধিকাংশই পথভ্রষ্ট থেকে যায়। এই খারেজিরা প্রায় সকলেই ছিল কট্টরপন্থি, অত্যন্ত উগ্র মতাবলম্বী। আলি (রা.)-এর প্রতি অনুগত এবং তাঁর খিলাফতের অধীনে থাকা সকল মুসলিমকে তারা কাফির বলে মনে করত। তারই ধারাবাহিকতায় প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রা.)-কে তারা সপরিবারে হত্যা করে। সম্মানিত এই সাহাবির অপরাধ কেবল এতটুকুই ছিল, তিনি আলি, মুয়াবিয়া (রা.)-সহ এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জড়িত পক্ষ-বিপক্ষের সাহাবিদের কাফির মনে করতেন না। শুধু এ কারণেই তারা ইবনে খাব্বাবকে নদীর পারে নিয়ে জবাই এবং তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পেট চিরে তাঁকেও নৃশংসভাবে হত্যা করে। খলিফা আলি (রা.) নৃশংস ও বর্বর এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করলে হত্যাকারীরা দম্ভভরে এ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়, এই কাফিরকে(!) আমরাই হত্যা করেছি।এটা ছিল সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহ; প্রকারান্তরে আলি (রা.)-এর খিলাফতকেই চ্যালেঞ্জ করে বসা। ফলে খলিফা হিসেবে আলি (রা.)-এর সামনে আর কোনো বিকল্প পথ ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি খারেজিদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। এর সূত্র ধরেই হারামাউতের প্রান্তরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সংঘটিত হয়। হারামাউতের প্রান্তরে খারেজিরা পরাজিত হলেও তাদের কিছুসংখ্যক পালিয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবারও খারেজি মতবাদ প্রচার শুরু করে। এভাবেই ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এই ভ্রান্ত মতবাদ । খারেজিদের মাধ্যমেই প্রথম ইসলামি চিন্তার বিকৃত প্রচার হতে থাকে। সমাজে সাধারণ মুসলমানদের মনোজগতে আসন গাড়তে থাকে চিন্তার নৈরাজ্য। অবশ্য এ রকম ধারার উন্মেষ আমরা খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই দেখতে পাই। তবে এটি ছিল বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা। যেমন : আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গনিমতের মাল বণ্টন করছিলেন। তখন বনু তামিম গোত্রের 'জুল খুওয়াইসারা আল্লাহর রাসূল! আপনি ইনসাফ করুন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে কে ইনসাফ করবে? আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে তো তুমি ক্ষতিগ্রস্ত ও নিষ্ফল হবে।উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, ওকে

যেতে দাও। তার কিছু সঙ্গীসাথি রয়ে গেছে। তোমাদের কেউ তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাত এবং তাদের সিয়ামের তুলনায় নিজের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালির নিম্নদেশে প্রবেশ করে না। তারা দ্বীন থেকে এত দ্রুত বেরিয়ে যাবে, যেমনিভাবে তির শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তিরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে, কিন্তু (শিকারের) চিহ্ন দেখা যাবে না। কাঠের অংশটুকু দেখলে তাতেও কোনো কিছুর দেখা মিলবে না। মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোনো চিহ্ন পাওয়া যাবে না। অথচ তিরটি শিকারের নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। তাদের নিদর্শন হলো এমন একজন কালো মানুষ, যার একটি বাহু নারীর স্তনের ন্যায় অথবা গোশতের টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা মানুষের মধ্যে বিরোধকালে আত্মপ্রকাশ করবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে–লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওই ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে, যারা কুরআন পড়বে; কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে তির বের হয়ে যায়। তারা মূর্তিপূজারিদের ছেড়ে দেবে এবং মুসলমানদের হত্যা করবে। যদি আমি তাদের পাই, তাহলে 'আদ' জাতির মতো তাদের হত্যা করব।অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবির ইবনে আবদল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 'জিরানা' নামক স্থানে দেখা করে। এটি সেই স্থান, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মাল বণ্টন করছিলেন। সাহাবি বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের ওপর রুপার টুকরাগুলো রাখা ছিল। রাসূলুল্লাহ মুষ্ঠিবদ্ধভাবে মানুষকে গনিমত দান। **(সহিহ বুখারি : ৩৬১০; সহিহ মুসলিম : ১০৬৪; মিশকাত : ৫৮৯৪ সহিহ বুখারি : ৭৪৩২; সহিহ মুসলিম : ১০৬৪; মিশকাত : ৫৮৯৪)**করছিলেন। তখন উপস্থিত ওই লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহকে যদি ইনসাফ না করি, তবে কে ইনসাফ করবে? আল্লাহর কসম! আমার পরে ভয় করুন এবং ইনসাফ করুন! রাসূলুল্লাহ বললেন, ধ্বংস তোমার জন্য। আমি তোমরা এমন কোনো লোক পাবে না, যে আমার চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ।সঙ্গে সঙ্গে উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন–না, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয়চাই। এমন করো, তবে লোকেরা বলবে, আমি আমার সাথিদের হত্যা করি.... ইতিহাসের পাতায় এই ঘটনা জুল খুওয়াইসারার ঘটনা হিসেবে পরিচিত। তবে এ ঘটনাটি ছিল একজন ব্যক্তির চিন্তা ও মতামতকেন্দ্রিক। এ চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে ওই সময় তারা সামাজিক, রাজনৈতিক, আদর্শিক কিংবা সাংগঠনিক কোনো পর্যায়েই আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। এর কারণ হলো, তখনও এই চিন্তার তেমন বিস্তৃতি ঘটেনি।উক্ত ঘটনার প্রায় ৪০ বছর পর পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনেকটাই পালটে যায়। আলি (রা.)-এর শাসনকাল নাগাদ এ রকম চিন্তাধারা লোকজন অনুকূল পরিবেশ পায়। ফলে সহায়ক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে তারা দ্রুত আত্মপ্রকাশকরতে থাকে। এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে (বিশেষ করে মিশর, পারস্য, লোহিত সাগরের তীরবর্তী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কিছু এলাকা; ইথিওপিয়া, সুদান ইত্যাদি এবং উত্তর আরবের রোমান সংস্কৃতিনির্ভর শাম, সিরিয়া, দামেশক এলাকা) বিভিন্ন মতাদর্শের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেন। তাদের অনেকেই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল মদিনায় হিজরত করেছেন, বসতি গেড়েছেন বা নানা ধরনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কও গড়ে তুলেছেন। নানা ধরনের চিন্তাচেতনার লোক এসে যুক্ত হয়েছেন একই প্ল্যাটফরমে। এ রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তনের সূত্র ধরে তাদের মধ্যে বাসা বাঁধতে থাকে চিন্তার নৈরাজ্য। আর ক্রমেই তা বিস্তৃত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত সাহাবিদের প্রাণ বধ পর্যন্ত শুরু হয়; তাও আবার কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার আড়ালে বৈধতা দিয়েই! এভাবেই শুরু হয় আকিদার বিচার। শুরু হয় কে কাফির, কার ঈমান কতটা ভঙ্গুর বা কতটা ভেজাল, তা নিয়ে তর্কবিতর্ক ও ফতোয়ার ঝড়। ফতোয়া না মানলে তাকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থাকে অবজ্ঞাকরে তারা নিজেরাই আকিদার বিচার করে। এরপর রায় ঘোষণা ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতি উম্মাহর কেন্দ্রীয় ঐক্য-চেতনার একেবারে মূলেগিয়ে আঘাত হানে। ইতিহাসের এই ঘটনার ভেতরে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার মতো অনেক কিছুই আছে। কেবল প্রয়োজন একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি। ইতিহাস সাক্ষী, এই খারেজিদের অধিকাংশই ছিল অল্পবয়স্ক যুবক। তাদের মধ্যে কপটতা বা ইসলামের ক্ষতি করার কোনো নিয়ত ছিল না। তারা বরং আন্তরিকভাবেই কুরআনের শিক্ষা ও অনুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে। তবে তাদের ভুলের পরিমাণটা ছিল মারাত্মক। তারা

কুরআনের মর্ম, এর দর্শন ও শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেনি। কুরআন ব্যাখ্যা ও তার বাস্তব প্রয়োগের বেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মনীতি ও প্রজ্ঞাময় কৌশলকে বিবেচনায় নেয়নি; বরং তাদের সকল কাজ পরিচালিত হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ দ্বারা। অথচ তারা প্রায় সকলেই ছিল অত্যন্ত ইবাদতগুজার। তারা এত বেশি কুরআন তিলাওয়াত করত যে, তাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যেত না। তিলাওয়াতের বশে কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে যেত! আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাবকে হত্যা করার সময় এক খারেজি ভুলক্রমে এক খেজুর বাগানের একটা খেজুর খেয়ে ফেলে। এতে তাদের এক নেতা তাকে তিরস্কার করে বলে, তুমি বাগানের মালিকের অনুমতি ছাড়াই খেজুর খেলে? এটা শুনে সেই খারেজি তৎক্ষণাৎ সেই খেজুর উগরে দেয়।আরেক খারেজি একইভাবে একটা শূকরকে আঘাত করে। ফলে তার সাথিরা বলে ওঠে, এটা তো অন্যায়! তুমি তো আল্লাহর জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং পরের সম্পদ নষ্ট করছ! তখন তারা সেই শূকরের অমুসলিম মালিককে খুঁজে বের করে তার দাম পরিশোধ করে দেয়। কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি ও ইসলামের পাবন্দি বজায় ছিল তা নয়; বরং বাস্তব জীবনেও অত্যন্ত আমলদার মুসলমান হিসেবে পরিচিত ছিল । ইতঃপূর্বে উল্লেখকৃত জুল খুওয়াইসারার ঘটনায় আমরা দেখেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে থাকতেই এমন একটি দলের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীকরে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, তার উম্মতের মধ্যে এ রকম একটা দলের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সেখানে তিনি এ জাতীয় লোকদের কিছু বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা হবে ইবাদতে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী; কিন্তু নিজেদের ইবাদতের জন্য হবে অহংকারী। লোকেরাতাদের ইবাদত দেখে অবাক হবে। এই গোষ্ঠীর লোকজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরবর্তী সময়কালে উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধের সময় আবির্ভূত হবে। সে বিষয়েও তাঁর বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মতভেদ ও মতানৈক্যের সময় তাদের আবির্ভাব হবে। তারা বিশ্বের সবচেয়ে সত্য ও সঠিক গ্রন্থ, পথনির্দেশনার আকর কুরআন থেকেই জ্ঞান নেবে। কিন্তু সে জ্ঞানকে তারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। নিজেদের বা কারও কল্যাণে কাজেও লাগাতে পারবে না। সে দিকে ইঙ্গিত করেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–শেষ জামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক ও নির্বোধ। তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে, অথচ তাদের ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম, কুরআন ও হাদিস বিষয়ে জ্ঞানের ধারক হলেও প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী হবে না, প্রজ্ঞাও থাকবে না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–তারা হবে নবীন, তরুণ ও নির্বোধ; অথচ নিজেদের অনেক জ্ঞানী মনে করবে। অপর একটি হাদিসে প্রখ্যাত সাহাবি আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা আর দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসবে না, যেমনভাবে ধনুক তূণীতে ফিরে আসে না। বলা হলো, তাদের আলামত কী? তিনি বললেন, তাদের আলামত হচ্ছে মাথা মুণ্ডন করা। তারা দ্বীনদারিতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে, এমনকি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। জুল খুওয়াইসারার এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই সম্ভবত প্রথম 'খারেজি' ছিল। সে নবিজির রায়ের ব্যাপারে প্রকাশ্যে এবং তাঁরই সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করে। আর নিজের মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে তার কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি তখনও ছিল না। সম্ভবত তার মতো চিন্তা ও চেতনা লালন করে–এমন কোনো লোকও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সময় ছিল না। অন্তত প্রকাশ্যে আসেনি। তাই চিন্তার এই মতপার্থক্য ওই সময় বিশেষ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারেনি।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর এক এক করে তিন সাহাবি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তাদের সময় অর্থাৎ প্রথম তিন খলিফার সময় সমাজে এ ধরনের চিন্তামানসসম্পন্ন লোকের উপস্থিতি থাকলেও তারা রাষ্ট্র ও উম্মাহর বিশেষ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে সেই পরিস্থিতি পরবর্তী সময়ে আর বজায় থাকল না। আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রা.) ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে বর্বরোচিত পন্থায় হত্যা করা হলো। ফলে ইসলামি খিলাফতের আমিরুল মুমিনিন ও সেনাপতি হিসেবে আলি (রা.)-কে অস্ত্র ধরতেই হলো এ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে । এরই প্রতিশোধ হিসেবে ৪০ হিজরির ১৭ রমজান জুমার রাতে কুফায় ফজরের সময় আলি (রা.)-এর মাথায় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। এর তিন দিন পর ৪০ হিজরির ২১ রমজান ৬৩ বা ৬৪ বছর বয়সে তিনি

শাহাদাতবরণ করেন। তখন একদল মুসলমান এত উচ্চমানের দৃশ্যমান তাকওয়া বা আল্লাহভীতি সত্ত্বেও তারা বর্বর হতে পেরেছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল, চিন্তার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমন্বয়হীনতা। অর্থাৎ তাদের ছিল প্রজ্ঞার অভাব । এমন প্রজ্ঞাহীন মুসলমানদের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আলি (রা.)-এর কর্মনীতি ছিল প্রজ্ঞাময় ও বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে আলাদা সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেও আলি (রা.) তাদের মসজিদে আসতে বাধা দেননি। তিনি তাদের ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাপ্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করেননি এবং তারা আগে অস্ত্রধারণ না করা পর্যন্ত তিনি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেননি।

মুসনাদে আহমাদ : ১২৯৭২৭ সহিহ বুখারি : ৬৯৩৩৮ সহিহ বুখারি : ৬৯৩০; মিশকাত : ৩৫৩৫৯ সহিহ মুসলিম : ২৪৬২, ২৪৬৯১০ সহিহ বুখারি : ৭৫৬২১১ সহিহ বুখারি : ৭৫৬২,সহিহ মুসলিম : ২৪৫১

প্রথম হোঁচট

এ রকম পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলিম সমাজ ইউরোপের মাটিতে সর্বপ্রথম ধাক্কা খায়। ৭১৯ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি মুসলিমরা নিজেদের স্পেনের মাটি থেকে উত্তর দিকে পাইরেনিজ পর্বতমালা পেরিয়ে আধুনিক ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে টেনে নেয়।এর মাত্র ছয় বা সাত বছরের মধ্যে ৭২৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ মধ্য ফ্রান্সের বুরগুন্ডি (ইঁৎমঁহফ) শহরে পৌঁছে যায়। ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক ফ্রান্সের আর্লস (অৎষবং) শহরে গিয়ে হাজির হয় মুসলিমরা !তখন ‘ফ্রান্স’ নামে কোনো দেশই ছিল না, ছিল গল বা গউল (এধঁষ)। আধুনিক ইতালি ও জার্মানির বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গঠিত এ ভূখণ্ডটি হলি রোমান অ্যাম্পায়ারের অন্তর্ভুক্ত। একে খ্রিষ্টবাদের প্রাণকেন্দ্রই বলা চলে। পোপের সকল ক্ষমতা, প্রভাব ও আয়ের উৎস ছিল বিস্তৃত ও বিশাল এই ভূখণ্ড । সংগত কারণেই মুসলমানদের এই অগ্রযাত্রা এবং নিজের বুকের ওপরে আসন গাড়তে দেখে ঘুম হারাম হয়ে গেল পোপের। তবে তার কপাল ভালো, পোপের কান্নাকাটি আর দেনদরবারে সেকালের ফরাসি রাজা চার্লস মার্টেল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'ব্যাটল অব ট্যুর' বা 'ব্যাটল অব পয়টার' হিসেবে পরিচিত। এরপর থেকে পুরো ইউরোপীয় সমাজ; বিশেষ করে পোপ ও পাদরিরা ছক কষতে শুরু করেন। এ লক্ষ্যে পোপের নেতৃত্বে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা এক ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেন। তারা তাদের শত শত চরকে অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা দিয়ে আন্দালুস, গ্রানাডা, সেভিল, কর্ডোভার গ্রামে-গঞ্জে, আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। জনৈক ফরাসি পাদরি 'চবৎভবপঃঁং'-এ ধারার সূচনা করেন। শত শত প্রশিক্ষিত পাদরিকে ছদ্মবেশী আলিম হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের দিয়ে মাজহাবি বিতর্ক উসকে দেওয়া এবং তা বছরের পর জিইয়ে রাখাই ছিল সেই কর্মসূচির অংশ। ফলে মুসলমানরা, বিশেষ করে আলিমদের একটা বিরাট অংশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কার আকিদা সঠিক, কার আকিদা ভুল, কে কাফির, মুনাফিক–তারা এসব জটিল(!) গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন ! তারা মুসলিম সমাজে বেতনভুক্ত লেখক, বক্তা ও বুদ্ধিজীবীও নিয়োগ দেয়। বহু খ্রিষ্টান পাদরিকে মুসলিম সমাজে খ্রিষ্টান পরিচয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রকাশ্যে রাসূলের জীবন ও কর্মকাণ্ড বিষয়ে কটূক্তি করানো হয়। উসকে দেওয়া হয় মুসলিম ও খ্রিষ্টান দ্বন্দ্ব । সৃষ্টি করা হয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নৈরাজ্যের। আন্দালুসের মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেননি। কারণ, তখন তারা ছিলেন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিভোর। ফলে মুসলিম আন্দালুস মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যেই খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়। এই বিভক্ত একপর্যায়ে এক এক করে ২৩টি ছোটো ছোটো রাজ্যে ভাগ হয়ে পড়ে ।এসব রাজ্যের কোনোটাই নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপরে ভিত্তি করে টিকে থাকার মতো সক্ষমতা ছিল না। তাদের না ছিল পর্যাপ্ত ভূসম্পদ, আর না ছিল শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি; গণভিত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না। আর রাজ্যের মহামান্য(!) সুলতান আর আমিররা নিজেদের বাবা বা ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে। কাজেই তারা নিজেরাও নিজেদের ভাই, সন্তান, আত্মীয়স্বজনকে বিশ্বাস করতে পারত না; এমনকি রাতের আঁধারে নিজেদের ছায়াকেও শত্রু হিসেবে দেখত । তারা একটা মুহূর্তও কেউ কাউকে বিশ্বাস করেনি। নিজেদের জানমাল ও ক্ষমতার নিরাপত্তার জন্য তারা বরং জনগণের ট্যাক্সের টাকায় ভাড়াটে খ্রিষ্টান মার্সিনারি সৈন্য পুষেছে। পার্শ্ববর্তী ছোটো ছোটো খ্রিষ্টান রাজাদের অবস্থা ছিল, তারা তারিক বা আবদুর রহমান কিংবা ইউসুফ বিন তাশফিনের নাম শোনামাত্রই ভয়ে-আতঙ্কে কাপড়। ভিজিয়ে ফেলত। সেই রাজাদেরই নিজেদের রক্ষক ও বন্ধু হিসেবে মেনে

নেয়; এমনকি তাদের সাথে পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি কিংবা সহযোগিতা চুক্তিও করে! এসব চুক্তির বলে মুসলমানদের ঐক্য ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে। এক গোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বী অপর কোনো মুসলিম গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ কিংবা যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রতিবেশী খ্রিষ্টান রাজাদের সামরিক সাহায্যও নিতে শুরু করে।কাজেই নিজ দেশে খ্রিষ্টান পাদরিদের পরিচালিত অন্তর্ঘাতমূলক এইসব কর্মকাণ্ড দমনে সুলতান ও আমিররা কার্যকর ও কঠোর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। বরং তারা ছিল চুক্তিতে আবদ্ধ প্রতিবেশী খ্রিষ্টান রাজ্য এবং তার জনগণের অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত। এই ভয়ে মুসলমান শাসকরা রাসূলকে বিদ্রুপ ও অপমানকারী এইসব খ্রিষ্টান পাদরির মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে সমুদ্রের ওপারে অর্থাৎ আধুনিক মরক্কোর সোয়েটা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়েই দায় সারে! সেভিলের সুলতান এ কাজটা করেছিলেন বলে ইতিহাসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সেকালের বিশ্বে সবচেয়ে ধনাঢ্য সমাজ; বাংলা, ভারত ও বাগদাদের পরে মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে এই আন্দালুসও বিশ্বের সবচেয়ে ধনাঢ্য এলাকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একই সাথে প্রাচীন হেলেনো-ল্যাটিন-টলেমি এবং ইন্দো-ব্যাবিলনীয়-আরব জ্ঞানবিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটে এ জনপদে। ফলে মাত্র কয়েকটি দশকের মধ্যেই এ ভূখণ্ড বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিশ্বে বাগদাদ ও দামেশকের সমকক্ষ হয়ে পড়ে। কোনো কোনো বিচারে তো তাদের চেয়েও উঁচু স্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে পরিণত হয়! পরিণত হয় কুরআন, হাদিস, দর্শন আর ফিকহচর্চার এক অনন্য তীর্থস্থান হিসেবে! আন্দালুসের ইতিহাসে উমাইয়া খলিফা হিশামের পক্ষে মুহাম্মাদ ইবনে আবু আমেরের দীর্ঘ ২৭ বছরের শাসনকাল ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। উত্তর দিকে ফ্রান্সের সীমান্ত এবং পশ্চিম দিকে আটলান্টিকের তীরঘেঁষে ছোটোখাটো দু-একটা খ্রিষ্টান রাজ্য তখনও কোনোমতে টিকে ছিল। তাদের হৃদয়েও এই মহান ব্যক্তি কাঁপন তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে[১৬] খলিফা হিশামের মৃত্যুর পরপরই বদলে যায় পুরো চিত্রপট। গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। একই সাথে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রও। এই ষড়যন্ত্রের হাত ধরে ক্ষমতার জন্য পিতা-পুত্র, ভাই ভাই, পরিবারের এক সদস্যের সাথে অপর সদস্যের দ্বন্দ্বও চলতে থাকে । দেখতে দেখতে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ব্যাপারটা এমন, তখন এক ভাই আরেক ভাইকে ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে ভূস্বামীদের দারস্থ হয়। আর চাতক পাখির দিতে পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান শাসক ও মতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকা খ্রিষ্টান শাসকরা এই সুযোগকে লুফে নেয়। তারা মুসলমান শাসকদের সাহায্য করতে দু-বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসে।ক্ষমতার স্বাদ না পাওয়া কিংবা যথাযথভাবে ভোগ করতে না পারার আক্ষেপে ফুঁসছিল এই যুবরাজরা। ফলে তারা বন্ধু খ্রিষ্টানদের সাহায্য-সহযোগিতা, পরামর্শ, উৎসাহ ও রসদ নিয়ে নিজ পিতা বা চাচা বা ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে! খিলাফতের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসে। ছোটো ছোটো অঞ্চল দখলে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে থাকে একের পর এক সালতানাত । এই মহামান্য সুলতান আর আমিরগণ(!) বছরের পর বছর ধরে পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান রাজাকে বাৎসরিক করও দিয়ে এসেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল, আক্রান্ত হলে এই সমস্ত খ্রিষ্টান রাজা যেন তাদের নিরাপত্তা দেন । মজার বিষয় হলো, এইসব রাজ্যের খলিফা বা আমিরগণ সকলেই ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন মুসলমান। তারপরও তারা শুধু ক্ষমতার লোভে একে অপরের গলা কাটতে ব্যস্ত থেকেছে। তাদের বেশির ভাগ নেতার কাছেই বৃহত্তর মুসলিম স্বার্থের চেয়ে নিজেদের পরিবার বা বংশ বা গোত্রের স্বার্থই ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রমাণ দেখতে পাই খলিফা মুসতাইনের কর্ডোভা আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়। এ সময় তিনি খ্রিষ্টান রাজা ইবনে আলফানসোর কাছে গোপনে সাহায্যের আবেদন নিয়ে দূত পাঠান । অপরদিকে ওই একই সময়ে তার প্রতিপক্ষ আরেক মুসলিম সুলতান মাহদিও গোপনে সাহায্যের আবেদন করেন। এমনকি তিনি খ্রিষ্টান রাজাকে আশ্বাসও দেন-খলিফা মুসতাইনের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করলে যুদ্ধ জয়ের পরে কৃতজ্ঞতাস্বরূ তার রাজ্যের সীমান্তসংলগ্ন মুসলিম দুর্গগুলো খ্রিষ্টান রাজাকেহস্তান্তর করবেন! তবে খ্রিষ্টান রাজা ইবনে আলফানসো এতটা বোকা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান। ফলে ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের বিপরীতে খ্রিষ্টবাদের লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ করেই তিনি দুর্বল মাহদির বদলে শক্তিশালী মুসতাইনকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন।কারণ তিনি জানতেন, সুলতান মাহদির যে অবস্থা, তাতে শক্তিশালী ও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা খলিফা মুসতাইনই জিতবেন। ইবনে আলফানসো কালক্ষেপণ না করে এক হাজার ষাঁড়, পনেরো হাজার ছাগল এবং অস্ত্রসহ কয়েক হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য পাঠালেন বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে। এ ভূখণ্ডে ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও ক্ষমতার পালাবদলে নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠতে খ্রিষ্টান রাজাদের জন্য এটা ছিল এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। নিজেদের মধ্যে আন্তঃকোন্দলের মতো এ হঠকারিতার মূল্য

কেবল একা মাহদিই দেননি। এর মূল্য দিতে হয়েছে খোদ খলিফা মুসতাইনকেও। এমনকি সুলতান মাহদির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পরেও খলিফা মুসতাইনকে প্রচুর মাশুল গুনতে হয়েছে। আর এই মাশুল ছিল যুদ্ধে পরাজয়ের থেকেও বেশি। এর চাইতে পরাজিত হওয়াটা আরও বেশি সম্মানের হতো। সম্ভবত তা ওই ভূখণ্ডে মুসলিম জনগণের জন্যও কল্যাণকর হতে পারত! ক্ষমতা পেতে আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত মাহদি ও খলিফা মুসতাইন; তাদের কেউই এ যুদ্ধে জিততে পারেননি। উভয়কেই তাদের হঠকারিতা আর নির্বুদ্ধিতার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ইবনে আলফানসোর সাহায্যে মুসতাইন কর্ডোভার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত খলিফা মাহদিকে ক্ষমতাচ্যুত ও দেশছাড়া করেন। অধিষ্ঠিতহন ক্ষমতায় ।এই উভয় মুসলিম সেনাপতির অনুসারী সৈন্যরা সকলেই ছিলেন মুসলমান। পরাজিত খলিফা মাহদির পক্ষে যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে, তারা মুসলমান ছিলেন । একইভাবে যুদ্ধে বিজয়ী মুসতাইনের দলের যারা নিহত হয়েছেন, তারাও ছিলেন কর্ডোভারই মুসলমান। অর্থাৎ উভয় পক্ষে মুসলমানরাই মারা গেছে। বিজয়ের পরে কর্ডোভার ক্ষমতায় বসলেও খলিফা মুসতাইনও এই যুদ্ধে জয়ী হননি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রাজ্য হারিয়ে বসেন; তাও আবার সেই বন্ধু খ্রিষ্টানদের হাতেই!কর্ডোভার মুসলিম খলিফা; বন্ধু(!) মুসতাইনের সাহায্যে এগিয়ে আসা খ্রিষ্টান রাজা ইবনে আলফানসোর পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত কুটিল। যুদ্ধের পরে বিজয়ী খলিফা মুসতাইনের সহযোগী হিসেবে প্রবেশ করে তথাকথিত বন্ধুরাষ্ট্রের(!) খ্রিষ্টান সৈন্যরা। তাদের লক্ষ্য ছিল অন্য কিছু। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই তারা মুসতাইনকে সহযোগিতা করতে এসেছিল; তাকে ভালোবেসে নয়। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তারা কোনো রাখঢাকও রাখেনি। তারা বরং মুসতাইনের চোখের সামনেই তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে। পরিকল্পনার প্রথম পর্বে তারা কর্ডোভার শত শত আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করে! কর্ডোভায় বুদ্ধিজীবী হত্যা ঘটিয়ে দেশটির বুদ্ধিবৃত্তিক রক্ষাকবচ ভেঙে দেওয়া হয়!ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! খলিফা মুসতাইনকে তার দেশের বাঘা বাঘা পণ্ডিত আলিমদের খ্রিষ্টান সৈন্যদের হাতে কচুকাটা হতে দেখতে হলো নিজ চোখে। নিজের চোখে, নিজের দেশে, তার নিজেরই প্রজাসাধারণ, সাধারণ মুসলমানদের নির্মম হত্যাকাণ্ড, পৈশাচিক বর্বরতা দেখেও সে টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারল না!কারণ, যারা এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটাচ্ছে, তারা প্রতিবেশী খ্রিষ্টান রাজ্যের খ্রিষ্টান সৈন্য হলেও এই বন্ধুরাই তাকে কর্ডোভা জয় করতে সাহায্য করেছে; পাছে সেই বন্ধুরা না আবার অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে !এভাবেই জ্ঞানবিজ্ঞানের লীলাভূমি কর্ডোভার উন্নতি আর প্রগতির চাকা থামিয়ে দেওয়া হয়। পেছনে মূল চালিকাশক্তি মুসলিম স্কলারদের হত্যার মাধ্যমে খ্রিষ্টান রাজা দেশটির বুদ্ধিবৃত্তিক রক্ষাকবচটা ভেঙে দেন। তারপর সেই ভাঙা কর্ডোভার শাসনভার তুলে দিলেন খলিফা মুসতাইনের হাতে।তবে এ কর্ডোভা আর আগের কর্ডোভা ছিল না; বরং এটি ছিল চরম নৈরাজ্যে ভরপুর একটি সমাজ। অনাস্থা আর অবিশ্বাসে ভরপুর। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যেই দেশটি চরম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিপতিত হয়। এর পরে এই ধারাতেই মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই দেশটি চূড়ান্তভাবে তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে ।এ ঘটনার মাধ্যমে খ্রিষ্টান পোপ ও পাদরিরা আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। শুধু পোপ ও গির্জার পাদরিরাই নয়; বরং আন্দালুসের এই ঘটনা বিশ্বের সমগ্র খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীকেই আবার নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে ।এভাবে প্রতিষ্ঠার মাত্র অর্ধ শতাব্দী যেতে না যেতেই ইসলামি খিলাফতের পতনের ধারাও শুরু হয়ে যায়। ৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সারাগোসা (তধৎধমড়ুধ) অঞ্চলে মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে ইবনে ইয়াকদান আল আরাবি আল কালবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহ সফল করতে তিনি ফ্রান্সের রাজা শার্লম্যানের কাছেসাহায্যের আহ্বান জানান ।আর রাজা শার্লম্যানও অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে সুলাইমানের সেই আহ্বানে সাড়া দেন। একসময় খ্রিষ্টানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ভূমিতে মুসলিমরাই আবার এভাবে খ্রিষ্টানদের ডেকে আনে। তাও আবার মুসলিমদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরতেই!ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস !আর এভাবেই মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও দুর্বলতা পোপ ও পাদরিদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তারাও আর দেরি না করে উত্তরাঞ্চলীয় সাগর পারের শহর ‘সান্তান্দার’ ও ‘ওবেদো' থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু করে। এরপর তারা আর থামেনি। দীর্ঘ সময় ধৈর্য আর ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে নিষ্ঠার সাথে লেগে থেকেছে। ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধেখ্রিষ্টানরা উত্তর-পূর্বের 'বার্সেলোনা' শহর থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিমের ‘পোর্টো' পর্যন্ত দখল করে নেয়। ১০৮০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তারা স্পেনের মধ্যভাগপর্যন্ত দখল করে ফেলে।তখনও মুসলমানরা সেই একইভাবে একে অপরেরআকিদা মাপা এবং তারবিচারে মগ্ন ছিল। তাদের চিন্তার জগতে নৈরাজ্যও ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছিল ।

পোপের কুটিল কৌশল : সুইসাইড মিশন

মুসলমানরা পরস্পর পরস্পরের গলা কাটতে ব্যস্ত থাকলেও খ্রিষ্টানরা ছিল নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত আপামর খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ নিত্যনতুন ফন্দি আঁটতে থাকে—কীভাবে মুসলমানদের উসকে দিয়ে মাঠে নামানো যায় ।এ রকম একটি ঘটনা ঘটে কর্ডোভায়; নবম শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে। ঘটনাটি ছিল এ রকম—একজন খ্রিষ্টান পাদরি কর্ডোভার বাজারে মুসলিম জনসমাগমপূর্ণ স্থানে মুসলমানদের সামনেই প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করতে থাকে।সময়টা ছিল জুমার দিন দুপুরবেলা। একপর্যায়ে সে বাজারের এক প্রান্তে অবস্থিত প্রধান মসজিদের চত্বরে দাঁড়িয়ে বা তারই আশেপাশে প্রিয় রাসূলকে গালাগাল করতে থাকে। ফলে মুসল্লিদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কটূক্তিকারী পাদরিকে ধরে তারা উত্তমমধ্যম দেয়। তারপরও সে নিবৃত হয়নি ।কাজেই, লোকজন তাকে টেনেহিঁচড়ে কাজির সামনে হাজির করে। পাদরি নিজের অপরাধের কথা অবলীলায় স্বীকার এবং আদালত চত্বরেই আবারও সে রাসূলকে অবমাননা করে বসে। উপায়ান্তর না দেখে কাজি তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ফলে সে খ্রিষ্টবাদের উদ্দেশ্যে প্রাণোৎসর্গকারী একজন বীর হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। পোপ ও পাদরিসমাজ এ ধরনের আত্মোৎসর্গকে মহিমান্বিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরতে থাকে। নানা ধর্মসংগীত রচিত হতে থাকে খ্রিষ্টবাদের এই বীরদের উদ্দেশ্যে! পুরো খ্রিষ্টবিশ্বজুড়েই একধরনের উত্তেজনা ও ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়।একই রকম ঘটনা পরপর আরও ঘটতে থাকে। বেশ কয়েকজন পাদরিকে এভাবে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়। কিন্তু ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাতে থামল না; বরং আরও বেড়ে যেতে থাকল। কর্ডোভার জনসমাজে বিষয়টি দারুণ বিতর্ক ও অস্থিরতার জন্ম দেয়। খুব সহসায় এ রকম আরও একটি ঘটনার সূত্রপাত হয়।একদিন স্থানীয় এক খ্রিষ্টান পাদার কর্ডোভার বাজারে বাজার করতে যায়। এক দোকানে সে জিনিসপত্র কেনার জন্য ঢোকে। কিন্তু সেখানে আগে থেকেই কিছু মুসলিম বসে গল্প করছিল।একজন খ্রিষ্টান পাদরিকে ঢুকতে দেখে তার সাথে তারা অপ্রয়োজনীয় আলাপ জুড়ে দেয়। ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মসংক্রান্ত নানা ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। এ দুটি ধর্মের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ এবং কেন শ্রেষ্ঠ? এমন প্রশ্নও তারা করে বসে উক্ত পাদরির কাছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন যেমন বাড়তে থাকে, তেমনই বাড়তে থাকে উত্তেজনাও। খুব শীঘ্রই পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্য সেভিলেও এ রকম ঘটনার সূত্রপাত হতে থাকল। সেভিলের মুসলমান শাসকরা বুঝতে পারেন—খ্রিষ্টান পাদরিদের উদ্দেশ্যই হলো, কিছু অতি আবেগী খ্রিষ্টানকে দিয়ে এ রকম ঘটনা ঘটিয়ে শহিদি মর্যাদা পেয়ে তা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুরোইউরোপব্যাপী খ্রিষ্টান জনমানসকে খ্যাপিয়ে তোলা।মূলত এটা ছিল পোপেরই পরিকল্পিত একটি সুইসাইড মিশন! রাজ্যের খ্রিষ্টান ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের চিড় ধরানোই ছিল এইমিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য।বিষয়টি বুঝতে পারেন সেভিলের সুলতান। তিনি এ রকম অপরাধে অভিযুক্ত কিছু পাদরিকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে মরক্কোর সিয়োটা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। এতেও সমস্যার সমাধান হলো না। এইসব পাদরি সেখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে এবং জেনে-বুঝে নিজেদের ওপর মৃত্যুদণ্ডের বিধান টেনে আনে।মুসলমানরাও পাদরিকে প্রশ্ন করতে থাকে ঈসা (আ.) ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এ দুয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? অতি উৎসাহী মুসলমানদের পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন করাটাই সমীচীন ছিল না। কারণ, সূরা বাকারার শেষে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন—'আমরা এমন মুসলমান, যারা আল্লাহ রব্বুল আলামিন কর্তৃক প্রেরিত সকল নবি-রাসূলকে বিশ্বাস করি এবং তাঁদের ওপরে ঈমান পোষণ করি। তাঁদের কারও মধ্যেই কোনো রকম পার্থক্য করি না।কাজেই এ অবান্তর প্রশ্ন ওই পাদরিকে ফাঁদে ফেলার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। খ্রিষ্টান পাদরি স্বাভাবিকভাবেই ঈসা (আ.)-কে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে। আর শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নবিজিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য ও ব্যঙ্গবিদ্রুপকরে বসে। পাদরির মুখে প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপার আপত্তিকর মন্তব্য শুনে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে অনেকেই ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে পাদরির ওপর হামলে পড়ে। কিছু ব্যক্তি ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই উক্ত পাদরিকে ধরে স্থানীয় কাজির দরবারে নিয়ে হাজির করে। কাজির কাছে তার বিচার চায়। তাদের দাবি একটাই, পাদরিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এমনকি আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেকেই পাদরির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেও চলে আসে। এই সাক্ষীদের মধ্যে অনেকেই ঘটনার সময় ওখানে ছিল না। তবে বাজারে ঘটনাঘটার দরুন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর তেমন অভাবও ছিল না ।পুরো ঘটনা এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য শোনার পরে কাজি

পাদরিকে প্রশ্ন করলে সে সব অভিযোগ স্বীকার করে নেয় ।অথচ একজন খ্রিষ্টান ধর্মীয়ভাবেই নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবি হিসেবে স্বীকার করে না। এটা জানা সত্ত্বেও তাদের এ ধরনের বিতর্কে টেনে নামানো এমন প্রশ্ন করাটাই তো অন্যায়ের মধ্যে পড়ে।কারণ, এ ধরনের প্রশ্ন করার পেছনে মূল উদ্দেশ্যই থাকে প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করা। উসকে দিতে পারলে সে নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারাবে। তখন তাকে দিয়ে এমন কিছু করানো বা বলানো যাবে, ফলে তাকে সমাজ কিংবা আইনের সামনে অপরাধী সাব্যস্ত করা সহজ হবে। কিন্তু বিজ্ঞ কাজি উক্ত পাদরিকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে কেবল ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে ছেড়ে দেন। মুসলমানদের দাবি তিনি অগ্রাহ্য করেন।কাজি ঠিকই বুঝেছিলেন, সমাজে ধর্মীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি করে খ্রিষ্টানদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীকে খ্যাপিয়ে তোলা ছাড়া এই বিচারের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সমস্যা হলো, কাজি বিষয়টি বুঝতে পারলেও সমাজের অধিকাংশ জনগণ; এমনকি নেতারাও এটা বুঝতে পারেননি। ফলে খ্রিষ্টান পাদরি, পোপ ও ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় সফলই হয়েছিল বলা যায়।ক্রমাগত ২৪৮ বছর খ্রিষ্টানদের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্যাপিয়ে তুলে ১০৯৬ বা ১০৯৯ সালে পোপ আরবান চূড়ান্তভাবে ক্রুসেডের ডাক দেন। শুরু হয়ে যায় ক্রুসেড।এ রকম পরিস্থিতি থেকে মুসলিম বিশ্ব উঠে আসবে, তেমন সুযোগ তাদের হাতে ছিল না। কারণ, তখন তারা ছিল শতধা বিভক্ত ও অন্তঃকলহে মগ্ন। এ সুযোগে১১৬০ সালের মধ্যেই পর্তুগালের রাজধানী লিসবন, স্পেনের টলেডো, সারাগোসারাজ্যগুলো মুসলমানদের হাতছাড়া হয়।আর ১২১২ সালে তিন-চতুর্থাংশ এলাকা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়। ১২৫০ সাল নাগাদ এ ভূখণ্ডের ২৩টি মুসলিম রাজ্যের মধ্যে এক এক করে ১৯টি রাজ্যই খ্রিষ্টানরা গিলে ফেলে। অথচ টিকে থাকা বাকি চারটি মুসলিম রাজ্য নিজেদের মধ্যে তখনও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি!বিজয় ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সীমাহীন গৌরবের। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ আর চিন্তার জগতে নৈরাজ্যের কারণে সহসায় তা লজ্জা, অনুশোচনা ও কলঙ্কে পরিণত হয় !

দৃশ্যপটের পরিবর্তন

এরই মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই (১২০০ খ্রিষ্টাব্দ) দৃশ্যপটে তাতারদের আবির্ভাব ঘটে। উত্তর চীন এলাকা থেকে উঠে এসে ঝড়ের গতিতে তারা এসে পড়ে মুসলিম বিশ্বের ওপরে। খাওয়ারিজম রাজ্যর ওপর ভয়ংকর মোঙ্গল সৈন্যদের হামলার মাধ্যমে এ ফিতনার শুরু। পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে তাদের ধ্বংসলীলা আর থামেনি।ততদিনে অবশ্য আব্বাসীয় শাসনে রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। আন্দালুসের মতো এখানেও ক্ষমতালোভী নেতারা নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। আর সেই সাথে শতাব্দী পুরোনো শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব তো আছেই। অর্থাৎ এখানেও সেই একে অপরের ঈমান, আকিদা আর মানহাজ পরিমাপের কালচার চালু ছিল। পারস্যের কেন্দ্রভূমি হওয়ার কারণে তা বরং আরও বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছিল।বীর গাজি সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের কাছে এক আতঙ্কের নাম। কিন্তু আরব উপদ্বীপ, মিশর ও সিরিয়ার একটি বড়ো অংশেও তার মৃত্যুর পরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও নৈরাজ্য শুরু হয়ে যায়।সালাহুদ্দিনের সন্তানরাও রাজ্য ভাগ নিয়ে পরস্পরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত; এমনকি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়ে। ফলে বাগদাদ থেকে শুরু করে মসুল, দামেশক, আলেপ্পো, কায়রো, কর্ডোভাসহ বলা চলে পুরো মুসলিম বিশ্বই এক তথৈবচ অবস্থার মুখে পড়ে যায়।সমাজে বাড়তে থাকে নৈরাজ্য ও বিভক্তি। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য ভেঙে পড়ে। বিশ্বের বুকে ঐতিহ্যধারী মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে ইউরোপ থেকে ক্রুসেডার খ্রিষ্টানরাও একের পর এক সিরিয়া, ফিলিস্তিন ওমিশরে অভিযান চালাতে থাকে।আর ঠিক এ সুযোগেই মোঙ্গলরা বাগদাদে হামলা করে বসে। তারা সেখানে পৈশাচিক ধ্বংসলীলা চালায়। শেষমেশ তাদের হাতে বাগদাদের পতন হয় এবং ৬৫৬ হিজরিতে খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ নিহত হন। এরপর চেঙ্গিস খানের বাকি অনুসারীরা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। আইনে জালুতের যুদ্ধ পর্যন্ত তাচলমান থাকে । শেষ পর্যন্ত মোঙ্গলরা সুলতান কুতুজ ও তার সেনাপতি বাইবার্সের নেতৃত্বে মামলুকদের হাতে পরাজিত হয়। ১২৬০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ফিলিস্তিনের গাজার কাছে আইন জালুত নামক স্থানে উভয় বাহিনীই পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় । ইতিহাসে এটি আইনে জালুতের যুদ্ধ নামে পরিচিত।এই যুদ্ধ ছিল মোঙ্গলদের ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা। এ পরাজয় তাদের দম্ভ, অহংকার আর গৌরবগাথাকে ম্লান করে দেয় অনেকখানি। একটা ধারণা সবার ভেতরে ছিল—মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছিল মনুষ্যশক্তি-বহির্ভূত একটা কাজ। কেননা, মরু প্রান্তরের সকল বাধাবিপত্তি তাদের কাছে হার মেনে গিয়েছিল। পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, সমুদ্র ও আবহাওয়ার গতি, দুর্ভিক্ষ, মহামারি কোনো কিছুই তাদের রুখতে পারে না। কিন্তু এই যুদ্ধ সেই ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়।মোঙ্গলদের কাছে আইন জালুতের এই পরাজয়ের স্বাদ ছিল অত্যন্ত তিক্ত। এই পরাজয় তাদের গোত্রীয় গর্ব ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়। ভেঙে পড়ে তাদের নৈতিক মনোবলও ।পরবর্তীকালে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই মোঙ্গল তাতাররা ইসলামের কাছে আশ্রয় নিয়ে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের হাতে পরবর্তী সময়ে রচিত হয় পুরো পৃথিবীর ইতিহাসেরই নতুন এক অধ্যায়।

হাওয়া বদল

টানা ২০০ বছর ক্রুসেড এবং অবর্ণনীয় নৃশংসতা চালিয়েও ইসলাম ও মুসলমানদের পৃথিবী থেকে নির্মূল করা গেল না। স্বাভাবিকভাবেই খ্রিষ্টানরা বেশ হতাশই হয়েছিল। তবে তাতারদের নৃশংসতা দেখে তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হলো।

সামরিক শক্তিতে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যার্থ হয়ে পোপ এবার কূটনৈতিক পথে এগোনোর চিন্তা করলেন। তাতারদের সাহায্য চেয়ে চিঠিসহ এক প্রতিনিধিদল পাঠালেন কারাকোরামে; মোঙ্গলদের দরবারে।

তখন চেঙ্গিস খানের নাতি সম্রাট গুইউক খান ক্ষমতায়। এই গুইটক খানের স্ত্রী ছিলেন আর্মেনীয় এক খ্রিষ্টান নারী। তিনি আবার ছিলেন পোপের ভক্ত। সেই রানির মাধ্যমেই পোপ সম্রাটের কাছে আর্জি জানান, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার সামরিক অভিযান শুরু করার। কিন্তু তাদের সে আশা বার্থ হয় ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে খ্রিষ্টানরা এ ভূখণ্ডে হারিয়ে ফেলতে বসে নিজেদের অস্তিত্বই। আর্নল্ড টয়েনবি সুন্দরভাবে তা বর্ণনা করেছেন এভাবে-

ভাবানুবাদ: 'খ্রিষ্টবাদের কর্তাব্যক্তিদের সাথে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পুরো ইসলামি সাম্রাজ্য জয় এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করা যাবে মর্মে খ্রিষ্টানরা বেশ আশাবাদী ছিল। এই দলে পশ্চিমা খ্রিষ্টান যেমন ছিল, তেমনই ছিল নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টানরাও। সে আশা বুকে নিয়েই পোপ ও ফ্রান্সের দূতরা ইউরোশীয় পাহাড়ি ভূখণ্ডে মোঙ্গল খানের রাজদরবারে গিয়ে হাজির হয়। খানরাও তাদের সাদরে বরণ করে নিলেও এ যাত্রায় তেমন কোনো সুফল আসেনি। মোগল সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরাধিকারীগণ সোৎসাহেই ধর্ম পরিবর্তন করলেন, তবে সে ধর্ম খ্রিষ্টবাদ নয়; বরং ইসলাম। ১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় খাজান ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনও খ্রিষ্টানদের সাথে সেলজুক সুলতানদের মাধ্যমে সূচিত হওয়া বৈরিতা মানুষ ভুলে যায়নি। এর প্রতিশোধস্বরূপ মুসলিমরা খ্রিষ্টানদের ওপর চড়াও হাতে শুরু করে। ফলে এতদঅঞ্চলে বসবাসরত এককালের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী সংখ্যায় কমতে কমতে একপর্যায়ে নিছক ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেয়।''' শুধু তা-ই নয়, ইসলাম তুর্কিদের মাধ্যমে নতুন এক উচ্চতায় উঠে এলো। এই বিষয়টি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির এক ঐতিহাসিকও তার গবেষণায় সেটা দেখিয়েছেন।১৮

মঙ্গোলিয়ার দুর্গম পাহাড়ি জনপদ থেকে বেরিয়ে এসে দুর্ধর্ষ এক ঘোড়সওয়ার জাতি চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে উন্মত্ত পঙ্গপালের মতো আছড়ে পড়েছিল ইসলামি সভ্যতার বুকে। তাদের এই আক্রমণের তীব্রতা ও ভয়াবহতা, নৃশংসতা ও নির্মমতা ছিল আকস্মিক ও অপ্রতিরোধ্য। আর তা এতটাই যে, শক্তিশালী খাওয়ারিজেমিরাও তাদের প্রতিরোধের কথা কল্পনাও করতে পারেনি।

তারপরও খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের উরগঞ্জ নগরীর যোদ্ধারা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ফলে এ নগরটির পতনের পর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যার নির্দেশ দেন ক্ষুব্ধ চেঙ্গিস খান।

এ সময়কালে শহরের পর শহর, নগরের পর নগরের অধিবাসীদের গণহারে হত্যা করা হয়। নারী-পুরুষ-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কাউকেই রেহাই দেওয়া হয়নি। আক্রমণের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা বিবেচনায়, সে সময়ের অনেক আলিম মোঙ্গলদেরই বাইবেল ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ হিসেবে বিবেচনা করতেও শুরু করেছিল। আর এ ধরনের বিশ্বাস সমকালীন মুসলমানদের মানসিক পরাজয়ের বিষয়টিকেই ফুটিয়ে তোলে। এমন মানসিকতা তাদের সামগ্রিক পরাজয়কে কেবল দ্রুততরই করেছে মাত্র।

খাওয়ারিজম দখলের পর ইসলামি সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু বাগদাদের পতনও হয় এই মোঙ্গলদের হাতেই। তাদের চতুর রণকৌশলের সামনে খাওয়ারিজম ও আব্বাসীয় প্রতিরোধ সমূলে বিনাশ হয়। মোঙ্গলরা পারস্য ও আরবের কাছে এসে পড়ে।

নতুন এলাকা দখল করার পর মোঙ্গলরা সেখানে তাদের ক্ষুদ্র একটি সেনা ইউনিট মোতায়েন করে রাখত। উদ্দেশ্য ছিল, বিজয়কে সংহত করা এবং স্থানীয় প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধযুদ্ধকে সামাল দেওয়া। এই ক্ষুদ্র সামরিক ইউনিটগুলোকে তারা 'টামা' হিসেবে অভিহিত করত।

এসব 'টামা'-তে নিযুক্ত সৈন্যদের সুরক্ষিত চৌকি বা ছোটো সেনাছাউনিতেই থাকতে হতো। নিজেদের পরিবার-পরিজন আনার অনুমতি তারা পেত না। ফলে বছরের পর বছর নিজ পরিবার থেকে দূরে থাকা এই সৈন্যরা স্থানীয় মুসলমান নারীদের বিয়ে করা শুরু করে।

এই সৈন্যরা নিজেদের জীবনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শূন্যতাকে পূরণ করতে শুরু করে স্থানীয় সংস্কৃতি দিয়েই। ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনাচারেও ইসলামি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। অর্থাৎ তারা দিনে দিনে ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির কাছাকাছি আসতে শুরু করে। এরই মাধ্যমে তারা ইসলামি দর্শন ও জীবনবোধের সাক্ষাৎ পায়। ফলে তাদের পুরো জীবন ও জীবনাচারে, মন ও মননে, বোধে ও বিশ্বাসে বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে।

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার বিশাল সাম্রাজ্য কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর মধ্যে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার গোল্ডেন হোর্ড, ইলখানাতে ও চাগাতাই খানাতের অধিকাংশ প্রজাই ছিল মুসলমান। এই অঞ্চলের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক নেতা ছিলেন সুফি ও আলিমরা।

বিভিন্ন কারণে মোঙ্গল শাসকবর্গ ও সেনাপতিরা প্রায়ই তাদের সংস্পর্শে আসতেন। ইলখানাতে ও চাগাতাই খানাতের অধিকাংশ মোঙ্গলই বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টানদের চেয়ে মুসলমান জনসংখ্যার সংস্পর্শেই বেশি আসতেন।

বিভিন্ন পেশায় মুসলমানদের দক্ষতা মোঙ্গলদের কাছে তাদের গুরুত্ব তুলে ধরে। মুসলমান কারিগর, প্রকৌশলী, শিল্পী, প্রশাসক, বিশেষ করে মুসলিম চিকিৎসকদের নিয়োজিত করা হয় পুরো মোঙ্গল সাম্রাজ্যজুড়ে। আর বলাই বাহুল্য, ততদিনে পারসিক ভূখণ্ডে পারসিক ও আরব মুসলমানরা চিকিৎসাবিদ্যায় আশ্চর্যজনক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করেছে। তাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল তৎকালীন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি জনপদেই।

মোঙ্গল বাহিনীর সত্যিকার অর্থেই এসব দক্ষতা ও লোকবলের প্রয়োজন ছিল। মোঙ্গল সেনাপতি ও খানদের সাথে তারা বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে অংশ নিতে থাকেন। পালন করতে থাকেন যুদ্ধাস্ত্র তৈরি, চিকিৎসা, যুদ্ধ চিত্রাঙ্কন, মানচিত্র তৈরিসহ অনেক দায়িত্ব।

মুসলিম প্রশাসকদের অনেকেই নিজের উদ্যোগে স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী গঠন করে প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজ খানের জন্য যুদ্ধও করেছেন। এটি প্রকারান্তরে এইসব মুসলমান সুলতানদের সাথে মোঙ্গল খানদের সম্পর্ককে আরও বেশি দৃঢ় ও আস্থাপূর্ণ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

মোরা আর্থিক ব্যবস্থায় দক্ষ মুসলিম বণিকদের সমাদর করতেন। যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে এই বণিকদের পুরস্কৃত করা হতো। অবাধে ব্যাবসা করতে স্থানীয় ভাষায় পরিচিত 'ওরটপ' নামের ছাড়পত্রও প্রদান করা হতো তাদের।

মোঙ্গলরা ছিল মূলত মরুচারী যাযাবর সংস্কৃতির। কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর বিজিত সভ্যতাগুলোর সুযোগ-সুবিধাগুলো তারা নিজ নিজ সুবিধামতো গ্রহণ করেছে। একটি ভঙ্গুর সংস্কৃতির এটা অন্যতম একটি লক্ষণও ছিল বটে। এজন্য তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণের পরও পূর্বের বিশ্বাস অনুযায়ী ওঝা ও কবিরাজদের কথামতো প্রাচীন ধর্মাচারও পালন করেছে। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও অনেক শাসক একই সঙ্গে এসব তান্ত্রিক কবিরাজ ও মুসলিম সুফি সকলেরই পরামর্শ নিতেন।

নিজামুল মুলক ছিলেন একজন পারসিক। গাজি সালাহুদ্দিনও ছিলেন একজন কুর্দি। জামালউদ্দিন আফগানি ছিলেন একজন আফগান আর সাঈদ মুরসি ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত সমকালীন পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক। তাঁরা কেউই। আরব নন।

তবে তাদের বিপরীতে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সুদানের মাহদি। তিনি ছিলেন একজন আরব। তবে তার মাহদি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া এবং ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল জামালউদ্দিন আফগানির। তার প্রেরণা আর নির্দেশনাতেই মাহদি সুদানে ব্রিটিশ দখলদারত্বের বিরুদ্ধে মাঠে নামেন এবং ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, ইসলামি সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে মোঙ্গলরা তাদের ভেতর থেকে নিজেদের অজান্তেই ধসে পড়েছে। যে ইসলাম নির্মূলে তারা নিজ পিতৃভূমি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেই ইসলামকে তারা কেবল আঁকড়েই ধরেনি; বরং তারা এই ইসলামি সংস্কৃতিকে ইউরোপের বুকে টেনেও নিয়ে যায়।

পাশ্চাত্য খ্রিষ্টানরা বা অন্য গোষ্ঠীরাও বারবার এই তুর্কিদের দ্বারাই প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে। ফলে তাদের মনন ও মননে যেমন তুর্কি-ভীতি তৈরি হয়েছে, তেমনই তাদের প্রতি জন্মেছে বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্ষোভও।

কাজেই, ইউরোপ ও তুর্কি মুসলমানদের সংস্কৃতির এই আদান-প্রদানের ভিত্তিটাই ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস আর বৈরিতার ওপরে তৈরি। ইউরোপ তুর্কিদের তথা, মুসলমানদের বরাবরই দেখেছে আগ্রাসী শক্তি হিসেবে। এই মানসিকতাই পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। আজও সেটা বিদ্যমান।

অত্যন্ত চমকপ্রদ বিষয় হলো, বহু গোত্রে বিভক্ত তুর্কিরা ইসলামের সান্নিধ্যে এসেছিল ইরানি গোষ্ঠী কিংবা ইরানভিত্তিক ইসলামি সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে।

অর্থাৎ ইউরোপ ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন গড়ে উঠে মুসলিম উসমানীয় তুর্কিদের দ্বারা, ঠিক একইভাবে তুর্কিরাও প্রথমবারের মতো ইসলামের সান্নিধ্যে আসে ইরানিদের ইসলামি সংস্কৃতির মাধ্যমে। উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক বা নেতিবাচক যা-ই হোক না কেন, প্রাথমিক জানাজানি ও পরিচয়টা হয়েছে সাংস্কৃতিক আবহের সূত্র ধরে। ইরানের কাঁধে ভর করেই ইসলামি সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর দিকে ট্রান্স-অক্সিয়ানার তুর্কিস্তানি ও পশ্চিমে এশিয়া মাইনরে। এ ধারার শুরুটা হয় সেলজুক তুর্কিদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে। কাজেই বলা চলে, ইরানি মুসলমানদের মাধ্যমেই সেলজুক তুর্কি গোষ্ঠী প্রথমবারের মতো ইসলামের সান্নিধ্যে আসে।

সেলজুক তুর্কি মুসলমানরা পশুপালন, কৃষিকাজ খাদ্যের ও ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে ইরানিদের অধীনে কাজ করত। প্রচণ্ড সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, ক্ষিপ্রতার অধিকারী ও কর্মঠ হওয়ার কারণে খুব সহসায় তারা ইরানের মুসলমান শাসকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আর পরবর্তী সময়ে এই সেলজুকরাই সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে। একপর্যায়ে প্রভাব খাটিয়ে খাওয়ারিজম অঞ্চলসহ তৎকালীন বিশাল ইরানি ভূখণ্ডের মধ্যেই নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। রাজশক্তির অধিকারী হয় নিজেরাই। আরও পরবর্তী সময়ে সেলজুক তুর্কিরা এশিয়া মাইনর অঞ্চলে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। নিজেদের তারা রুমি-সালজুক বলে পরিচয় দিত।

কারণ, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ায় তারা রুমি বা 'রোমবাসী' হিসেবেও নিজেদের অভিহিত করত। ইতিহাসেও তাদের সেভাবেই পরিচিত করা হয়। উসমানি বা অটোমান তুর্কিদের শাসনের আগপর্যন্ত সেলজুকরা তাদের ওই স্বাধীন রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

এরপর থেকে বিশ্বের সভ্য অঞ্চলে, তথা ভারত থেকে শুরু করে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত অঞ্চল শাসন করেছে তুর্কিরা। প্রায় ১০০০ বছর পর্যন্ত টিকেছিল তাদের শাসন। কিন্তু এ সময়ও তাদের রাষ্ট্রের সব অঞ্চলেই প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উঁচু পদগুলোতে আসীন ছিল ইরানিরাই।

খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে একটি বিষয় দেখা যায়। তিনি তার ভ্রমণকালে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরেই গেছেন। সেই শহরগুলোতে তিনি ইরান থেকে আসা বহু মুহাজির ব্যবসায়ী, ফকিহ, সুফি, আলিম, হস্ত ও কারুশিল্পী, চিত্রশিল্পী, সৈনিক বা জেনারেল, রাজনীতিবিদসহ প্রায় সকল স্তরের মানুষের দেখা পান।

ইসলামের আবির্ভাব ও প্রাচ্যে মুসলমানদের বিজয় এখানকার বিভিন্ন জাতির মধ্যকার সাংস্কৃতিক লেনদেনকে জোরদার করে। দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব ইরান জয় করার পর হিজরি প্রথম শতকেই মুসলিমরা খোরাসান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানাও জয় করে ফেলে।

আবার অষ্টম শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে চীনের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত 'কাশগাড়'ও চলে আসে তাদের হাতে। সময়টি ছিল ৭০৫-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ। এ বিজয়ের কারণে বৈশ্বিক বাণিজ্যের লাইফলাইন সিল্ক রোডের পূর্ব অংশের ওপর দুসলমানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ একটি যুদ্ধ এবং ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন

এ রকম সময় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর পশ্চিম চীনের তাং (সাং) রাজবংশের সাথে মুসলমানদের সংঘটিত যুদ্ধে অর্থাৎ ব্যাটল অব তালাশ যুদ্ধে চীনারা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে।

চীনা যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে দুজন বন্দি ছিল কাগজ তৈরিতে দক্ষ। প্রাণ বাঁচাতে বা মুক্তি লাভের শর্তে তারা মুসলমানদের এই কাগজ তৈরির কৌশলটা শিখিয়ে দেয়। ফলে মুসলিম সমাজে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার ধারাটি অসম্ভব

গতি লাভ করে। কাগজ সহজলভ্য হওয়াতে বই লেখা, ছাপা ও প্রচারের এক শক্তিশালী ধারা গড়ে ওঠে। এ ঘটনা ছিল পারস্যজুড়ে মুসলিম সমাজের জন্য এক স্মরণীয় ঘটনা।

ইসলামি খিলাফতে প্রথমবারের মতো কাগজ তৈরি শুরু হয় সমরখন্দে। ফলে সাড়া পড়ে যায় পুরো মুসলিম বিশ্বজুড়ে। চাহিদা বহু গুণে বাড়ায় বাগদাদে অষ্টম শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ ৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে কাগজ তৈরির কল প্রতিষ্ঠিত হলো। বাগদাদের কাগজগুলো গুণে-মানে হয়ে উঠল আরও উন্নত। মুসলিম বিশ্বের প্রথম কাগজের বাজার ছিল বাগদাদের 'সোউক আল ওয়ারেকিন'।

সমরখন্দ থেকে শুরু হওয়া কাগজ প্রস্তুতকরণের এই কৌশল ও জ্ঞান সহসায় ছড়িয়ে পড়ল সিরিয়া, দামেশক, বাগদাদ, জেরুজালেম ও কায়রোসহ প্রতিটি মুসলিম জনপদে। একইভাবে তা ছড়িয়ে পড়ে সিরিয়া, ইয়েমেন, উত্তর আফ্রিকাতেও। সেসব স্থানেও একের পর এক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে কাগজ তৈরির কল।

ঠিক এ রকম সময়েই ইউরোপের পশ্চিম-দক্ষিণাংশ তথা স্পেন মুসলমানদের হস্তগত হয়। দেশটিতে উমাইয়া শাসন চালু হয়, যেটি আন্দালুস নামে পরিচিতি পেতে থাকে। এখানকার জাটিভা (আরবি উচ্চারণ ইয়তিবা) শহরেও মুসলমানরা কাগজের কল স্থাপন করে। এটি ছিল ইউরোপের মাটিতে প্রথম কাগজ কল। এখানে বিশেষ ধরনের মোটা কাগজ উৎপাদন হতো, যা বই বাঁধাতে ব্যবহৃত হতো।

ইউরোপীয় ভূখণ্ড তথা ভ্যাটিকানের নাকের ডগায় এ জনপদ জয়ের প্রভাব ছিল বেশ। এর কারণে গ্রিক হেলেনিক দর্শন ও সাহিত্য সহজেই মুসলমানদের হাতে এসে জমা হতে থাকে এবং মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে।

এ সময়েই এক অবিস্মরণীয় গতিতে ইসলামি দর্শন, বিশ্ব ইতিহাস, হাদিস, ফিকহ ও তাফসির নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। এসব ঘিরে সাহিত্যও রচিত হতে থাকে। আগে এগুলো চর্চা হতো খানকা আর উসতাজের আসরে। এবার তা লিখিতরূপেও সংরক্ষিত হতে থাকল।

সমরখন্দ, বাগদাদ, মসুল, দামেশক, ত্রিপোলিসহ বিভিন্ন স্থানে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হলে এসব লেখাজোখা সর্বসাধারণের জন্যও সহজলভ্য হয়ে পড়ে। এর অনিবার্য পরিণতিতে দূরদূরান্তে কষ্টকর যাত্রা ছাড়াই অনেকেই নিজ নিজ ঘরে বসেই ভিনদেশি স্কলারদের চিন্তা ও মতের সাথে পরিচিত হতে শুরু করে।

এসব জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ ছিল মুসলমান। অথবা বলা চলে, এসব জনপদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাবলয়ে মুসলমানরাই অধিষ্ঠিত ছিল। সমাজ ও দেশ পরিচালনার দায়ভারও ছিল তাদেরই হাতে। তারাই সর্বসাধারণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছিলেন। যে নীতির মূলে ছিল জ্ঞানভিত্তিক একটি সমাজ গড়ার প্রত্যয়। জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলমানের অবশ্যপালনীয় কাজ বা দায়িত্ব। সে কারণেই ইসলামে মুসলমানদের জ্ঞানচর্চার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশনা ও প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। সমাজে জ্ঞানী ও মূর্খের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থান নিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামিন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বলেছেন-যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?

একজন জ্ঞানীকে চক্ষুষ্মান ও মূর্খকে অন্ধের সাথে তুলনা করে অন্যত্র তিনি বলেছেন-'হে নবি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক ও অভিন্ন হতে পারে?'

এই চক্ষুষ্মান তথা জ্ঞানীদের নৈতিক অবস্থানের সাথে সাথে তাদের সার্বিক মর্যাদাকে জ্ঞানের কারণেই উচ্চে তুলে ধরবেন, সে আশ্বাসও দিয়েছেন। বলেছেন-'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

আরও বলেছেন-'প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে বেশি ভয় করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তাঁর অসংখ্য বাণী ও নির্দেশনায় জ্ঞান আহরণের জন্য বলেছেন। জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ জুগিয়েছেন। এমনকি তিনি

তাঁর দাওয়াতি মিশনের শুরুতে প্রচণ্ড বৈরী পরিবেশেও অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে দারুল আরকামে সাহাবিদের একত্রিত করে জ্ঞানচর্চা করতেন, করাতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, ইলম অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ। তিনি আরও বলেছেন, হিকমত ও ইলমের একটি কথা জ্ঞানীর হারানো মূল্যবান সম্পদের মতো। সুতরাং যেখানে পায়, সেখান থেকেই যেন সে তা সংগ্রহ করে নেয়।

জ্ঞানার্জন বিষয়ে আলি (রা.) বর্ণিত একটি উক্তি বহুল প্রচলিত। তিনি বলেছেন, জ্ঞান শিক্ষা করো, যদিও তা মুশরিকদের নিকট থেকে হ...

উত্তরনের পূর্বকথা

সেক্যুলারিজমের চর্চায় জর্জরিত বিশ্ব আজ মুক্তির পথ খুঁজছে। এই খোঁজাখুঁজিরইপ্রতিফলন ঘটছে সারা বিশ্বময় ধর্মীয় ভাবাবেগের পুনরুজ্জীবনেরমাধ্যমে। অর্থাৎরাষ্ট্র সেক্যুলারিজমের কথা বললেও সমাজবাসী ধর্মকেই আশ্রয় করছে। তারা ধর্মের কাছেই ফিরে যাচ্ছে।বিশ্ব আজ অবধি প্রায় প্রতিটি মতবাদকে ভিত্তি করে নিজেদের একক ও সামষ্টিক জীবন গড়ার চেষ্টা করেছে। তবে বস্তুবাদী সাফল্য পাওয়ার পরেও তারা আত্মিক ও মানসিক শান্তি, স্থিতিশীলতা, সর্বজনীন মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জন করতে ব্যর্থ। কাজেই প্রকৃত অর্থেই তারা হতাশ হয়েছে। এই হতাশা থেকে মুক্তির খোঁজে তারা বিশ্বের নানা প্রান্তে দর্শন খুঁজছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তাদের সামনে প্রকৃত অর্থে কোনো মডেল সমাজ নেই । তবে তারা এমন সব ব্যবস্থাপনাকে বেছে বেছে নিজ নিজ দেশ ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে বা করার চেষ্টা করছে, যা মূলত ইসলামেরই শিক্ষা। এই বাস্তবতা বিশ্ব মুসলমানদের জন্য চরম লজ্জাজনক বিষয় ।অথচ পুরো বিশ্বের জন্য; বিশেষ করে অনৈসলামিক ও অমুসলিম বিশ্বের সামনে ইসলামকে তুলে ধরতে এই পরিস্থিতি মুসলমানদের একটি মোক্ষম সুযোগ হতে পারত।মুসলমান দেশগুলো এক্ষেত্রে চরমভাবে পিছিয়ে রয়েছে। কেবল পিছিয়েই নয়; ইউরোপীয় অনেক দেশই আজ ইসলামের দর্শন যেমন: মানবিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার আল কুরআনের এইসব মৌলিক নির্দেশনা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের চেয়ে অনেক এগিয়ে।অথচ উপরিউক্ত বিষয়সমূহ তথা আল কুরআনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইন (প্রশাসনিক) ও রাজনৈতিক শিক্ষা ও দর্শনের প্রতিফলন মুসলিম দেশসমূহের সমাজে কিংবা মাঠে-ঘাটে-বাজারে সব ক্ষেত্রেই দেখা যাবে; এটাই তো প্রত্যাশিত ছিল।কিন্তু দুঃখজনক হলো, বিশ্বের ৭৬/৫৭টি মুসলিম দেশের মধ্যে একটিও আজ এমন নেই, যাদের সমাজ কিংবা রাষ্ট্র, ব্যাবসা কিংবা প্রশাসন, রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি; কোথাও ইসলামের সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিফলিত হচ্ছে। বাস্তব অবস্থা হলো–বিশ্বে এমন একটা দেশও নেই, যেখানে ইসলামে বর্ণিত সর্বজনীন মানবিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অথচ প্রত্যেক মুসলিম দেশের সরকার ও সুশীল সমাজই নিজেদের ইসলামের খাদেম হিসেবে জাহিরকরে চলেছেন।আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক বিশ্বের ২০৮টি দেশের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সরকার, রাজনীতি, প্রশাসন ও ঘেঁটে একটা চমকপ্রদ বিষয় তুলে এনেছেন। এটি বিশ্ব-মুসলমানের জন্য চরম আইনকানুনলজ্জাজনক ব্যাপার।তাদের গবেষণামতে, আল কুরআনে বর্ণিত সামাজিক সাম্য, শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মানবাধিকার, আইনের শাসন ও রাজনৈতিক বিধিবিধান মেনে চলা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে একটিও মুসলিম দেশ নেই। প্রথম ১০টি দেশ হলো–আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক, লুমেনবার্গ, সুইডেন, ইউনাইটেড কিংডম, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও বেলজিয়াম। কেবল উক্ত দশটিই দেশই নয়, প্রকৃত অর্থে ওই গবেষণার ফলাফল হিসেবে প্রাপ্ত তালিকার প্রথম ৩২টি দেশের মধ্যে একটি মুসলিম দেশও নেই। একাধারে ৩২টি অমুসলিম দেশ বিশ্বের ৭৬/৫৭টি মুসলিম দেশকে পেছনে ফেলেছে মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক বৈষম্য নিরোধ, অর্থনৈতিক শোষণ বিমোচন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মৌলিক মানবাধিকার রক্ষাবিষয়ক কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়নের বেলায়!তালিকায় থাকা ২০৮টি দেশের মধ্যে ৩৩ নম্বরে প্রথম একটি মুসলিম দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটা মালয়েশিয়া। প্রথম ৫০টি দেশের মধ্যে মাত্র দুটি মুসলিম দেশ রয়েছে–মালয়েশিয়া আর কুয়েত। কাবার দেশ, মসজিদে নববির দেশ, প্রিয় নবিজির দেশ; সৌদি আরব তালিকার ৯১ নম্বর স্থানে রয়েছে। ফেরাউনের মিশর আছে ১৮৯ নম্বরে। কুয়েত ৪৮ এবং আরব আমিরাত ৬৪ নম্বরে। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির উক্ত গবেষণার ব্যাপারে অনেক মুসলমান হয়তো ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা কথা, নানা ওজর-আপত্তি তোলার চেষ্টা করবেন। বিধর্মীদের, কতটা নির্ভরযোগ্য ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন।উত্তরে বলি, প্রায় কয়েক লক্ষ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত

মুসলমান আমরা ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন দেশে অবস্থান করে এ সমাজে মানবাধিকার, আইনের শাসন, সামাজিক সাম্য এসব তো নিজেদের চোখেই দেখছি।ইসলাম কেবল মুসলমানদের সম্পত্তি, এমনটা ভাবলে আমরা ভুল করব; বরং ইসলাম পুরো বিশ্বের সম্পত্তি। তারা ঈমান গ্রহণের ঘোষণা দেয়নি সত্য। কে জানে, কাল হয়তো দিতেও পারে! আর খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণের হারও আজ সেসব দেশেই সবচেয়ে বেশি। এর পেছনে সম্ভবত এটাই বড়ো কারণ, সেইসব সমাজে মানবাধিকার আর আইনের শাসনের নামে ইতোমধ্যেই মানবিক সাম্য ও সামাজিক মর্যাদার একটি প্রাথমিক স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।এক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা চরমভাবে পিছিয়ে রয়েছি। পুরো মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব ভূমি, যে ভূমিকে ইসলামের জন্মস্থান ও প্রাথমিক বিকাশকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেই আরব দেশেই মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সাম্য ভূলুণ্ঠিত হয়ে বসে আছে। সারা বিশ্ব থেকে; বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ থেকে আগত বিদেশিদের প্রতি প্রাত্যহিক জীবনে কর্ম সম্পাদন ও লেনদেনের বিষয়ে তাদের কর্মকাণ্ড বিচার করলেও সে বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।কেবল আরবদের বেলাতেই-বা বলি কেন?নিজেদের সমাজের দিকে তাকালেই- বা আমরা কী দেখি?আমাদের মা-বোন, জায়া-জননীদের ক্ষেত্রে কি আমরা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি?বোনদের সম্পত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা আত্মীয়স্বজন আর পাড়া- প্রতিবেশীদের সাথে সদ্‌ভাব রক্ষার ক্ষেত্রে কি সাম্য ও ইনসাফ বজায় রেখেছি?বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীদের কথা তো বাদই দিলাম। আমরা হাসতে হাসতে জুলুম করি, জুলুমকে প্রশ্রয় দিই। আর জালিমের সহযোগী হই, তার গুণকীর্তন করি সামান্য কিছু খুদকুঁড়ো পেলেই !এই তো মাত্র কিছুদিন পূর্বেই একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, সেটা উল্লেখ করা বোধ করি খুব একটা অন্যায় হবে না। এবারে বাংলাদেশ সফরের একটি পর্যায়ে পাবনা থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে সিরাজগঞ্জে যাত্রাবিরতিতে দেখলাম, পাশের সিটের দম্পতি নেমে গেলেন। কিশোরী কাজের মেয়েকে বাসের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে বাচ্চা ছেলেটাসহ তারা ঢুকলেন ফুড ভিলেজে ।সেখানে মুরগির মাংস ও তন্দুর রুটি খেয়ে আসার সময় ছেলেটার হাতে একটা ইগলু আইসক্রিম ধরিয়ে দিলেন। অথচ বাসের কাছে প্রায় আধা ঘণ্টা প্রচণ্ড গরমে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরী কাজের মেয়েটার জন্য কিছুই আনলেন না।পান চিবুতে চিবুতে গিয়ে বাসের সিটে বসলেন! দম্পতি যুগলের পুরুষটার পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি আর ভদ্রমহিলার মাথায় সুন্দর হিজাব!এটা কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয় বাংলাদেশে। কদাচিৎ ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই প্রায় একই চিত্র। আমাদের এ দেশ, এ সমাজ মানবিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। অথবা মানবিক সমাজের যে একটা আবহ এ সমাজে একদিন উপস্থিত ছিল, সেই আবহকে আরও শক্তিশালী ও বিকশিত করা তো দূরের কথা; যেটুকু ছিল, সেটুকুও আমরা ধরে রাখতে পারিনি।অথচ এর বিপরীতে খ্রিষ্টবাদী কিংবা অমুসলিম সমাজে এর বিপরীত চিত্রই দেখি। যদিও বিশ্বমঞ্চে আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সেইমানবিকতার ন্যূনতম প্রকাশও থাকে না ।মনে পড়ে, ২০১৬ সালের অক্টোবরে একটি কাজে নর্দান আয়ারল্যান্ডে যেতে হয়েছিল। বেলফাস্ট এয়ারপোর্ট থেকে ডযরঃবধননবু এবং সেখান থেকে আবার সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঈৎধভিড়ৎফংনঁৎহ হয়ে বেলফাস্টে ফেরত এসেছিলাম। সাথে ছিলেন টিম ট্রেভর ও অ্যালিসন বোম্যান। সারাদিন ওদের আচার-আচরণ, ভদ্রতা, ওয়াদা রক্ষায় আন্তরিকতা, আমার নামাজের জায়গা ব্যবস্থা করে দেওয়া, হালাল খাবার জোগাড়ের জন্য তাদের ব্যগ্রতা আজও স্মৃতিতে ভাস্বর। মন বলে, সুযোগ পেলেই আবার তাদের কাছে ছুটে যাই

কাজেই ভাবতেই হবে

আমাদের ভাবতেই হবে, কীভাবে আমরা একটি মানবিক সমাজ গড়ে নিতে পারি। কারণ, মানবিক মর্যাদা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোনো সমাজ না গড়ে ওঠে; টিকেও থাকতে পারে না।প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মদিনায় হিজরতপরবর্তী সময়ে একেবারে প্রাথমিক ধাপে তিনি মুহাজির ও আনসার এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে কী ধরনের সামাজিক সাম্য ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি জানতে হবে। তার ফলাফল কী হয়েছিল, সে বিষয়টি খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে। আর সেখান থেকেই শিক্ষা নিতে হবে আজকের মুসলমানদের। আমাদের মনে রাখতে হবে, তখনও আল কুরআনের সকল নির্দেশনা নাজিল হয়নি। কুরআন নাজিল পূর্ণাঙ্গ হতে আরও দশটি বছর বাকি ছিল। সে রকম একটি সময়েই তিনি মদিনার বুকে একটি মানবিক সাম্য ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।একটি আদর্শিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এই দুটি হলো মৌলিক ও প্রাথমিক শর্ত। প্রতিটি মানুষ সেখানে নিজেকে সম্মানীয় ও মর্যাদাসম্পন্ন ভাবতে শিখবে, সে রকম মূল্যায়নও পাবে। তবেই কেবল ওইমানুষ উক্ত সমাজ গঠনে নিজের সকল শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে মাঠে নামবে। তারা মাঠে নামবে সমাজ গড়তে, আর গড়া সমাজকে রক্ষা করতে। একটি শক্তিশালী ও সভ্য সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখা প্রতিটি শিক্ষিত ও সচেতন মানবসন্তানের অতি স্বাভাবিক ও মানবিক প্রবৃত্তি। তবে কাঙ্ক্ষিত সেসমাজ এমনি এমনি গড়ে উঠতে পারে না।একটা গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে কিছু কমন বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করলেই সেখানে ক্রমে একটা সমাজের বিকাশ হতেথাকে। নিজেদের অলক্ষ্যেই তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ রীতি অর্থাৎ কমন রুলস গড়ে ওঠে। তারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মেনে চলার মতো নিয়মনীতি তৈরি করে নেয় এবং অধিকাংশ সদস্য সেগুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে। এটি সরবে বা নীরবে হয়। পৃথিবীর সূচনা থেকে এ নিয়মেই সমাজ তৈরি হয়েছে।আদম ও হাওয়া (আ.) মিলে যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে তারা যুগ বিবেচনায় সর্বোত্তম নিয়মনীতি ও প্রথা চালু করেছিলেন। এর পরের প্রজন্ম সময়ের বিবর্তনে সেইসব নিয়ম ও প্রথা থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। তারা বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তাবস্থায় নানা জনপদে ছড়িয়ে পড়ে। নিজেদের মতো করে গড়ে তোলে সমাজ। সেইসব সমাজের রীতিনীতি কতটা বর্বর বা উন্নত, সে বিতর্ক এখানে মুখ্য নয়। সমাজ গঠন ও বিকাশের এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।আবার ওই সমাজ তার ভেতরে বা আশেপাশে কোনো উন্নত রীতিনীতি ও প্রথাসমৃদ্ধ নতুন সমাজের বিকাশ হতে দেখলে সে সেই উন্নত নীতিরীতিকে গ্রহণ করেছে। না হলে নিজেরাই সেই উন্নত সমাজে বিলীন হয়ে গেছে। আর এটাই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম।আমাদের মুসলিম প্রজন্মের চিন্তামানসে গড়ে ওঠা দূষণ ও বিপর্যয় কোন পথে এসেছে, আমরা তা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। এখন উত্তরণের পথ খুঁজতে ও জানতে হলে সবার আগে একটি কাজটি করতে হবে। আর তা হলো, চিন্তার পুনর্গঠন এবং চিন্তাদূষণ থেকে মুক্তি পাওয়া।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মিশনের একেবারে সূচনা পর্যায়ে ঠিক এ কাজটিই করেছেন। তিনি সমাজবাসীর সামনে স্বচ্ছ চিন্তাদর্শন তুলে ধরেছেন। আর সেই আলোকে তাদের চিন্তামানস পুনর্গঠন করেছেন। এমনকি হিজরতের পূর্বে মদিনায় (বাইয়াতে আকাবার পরে) নিজ প্রতিনিধি হিসেবে একজন সম্মানিত সাহাবিকে পাঠিয়ে সেখানে কিছু সমমনা মানুষ সৃষ্টি করে তাদের চিন্তামানস গড়ে তুলেছিলেন।তাঁরাই পরবর্তী মাত্র বছর দুয়েকের মধ্যে মদিনার সমাজের গণ মনস্তত্ত্ব বদলে দিতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেন। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে বিনা যুদ্ধে কোনো রকম সংঘাত ব্যতিরেকেই মদিনার শাসনভার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে তুলে দেন।আরও একটা চমৎকার উদাহরণ রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে। আর তা হলো, হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের মাত্র বছর দুয়েক সময় স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে মক্কাবাসী ও মদিনাবাসীদের সামাজিক যোগাযোগ সহজ ও সাবলীল হয়ে যায়। ফলে মক্কাবাসীর চিন্তামানসে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে তারই পরিণতিতে একপ্রকার বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয়ের সময় তারা রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে নগর সঁপে দেন।এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে যখন আমরা সমাজ পুনর্গঠনের কথা বলছি, তখনও আমাদের সেই একই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। কারণ, একমাত্র কার্যকর পথ এটাই। পথটি আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিতও বটে। আল্লাহর দেওয়া ওই চার দফা কর্মসূচি বিবৃত হয়েছে কুরআনের সূরা বাকারার **১৫১** নম্বর আয়াতটিতে। উক্ত আয়াতটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখুন, সেখানে বলা হচ্ছে–'আমি পাঠিয়েছি

তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল; যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তার তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয়, যা কখনো তোমরা জানতে না ।আলোচ্য আয়াতটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তায়ালা সমাজ বদলে কর্মপন্থা কী হতে হবে, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দায়িত্বপালনের কথা বলে দিয়েছেন। সেগুলো হলো :**এক.**যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন; (কহড়ৎিবফমব ড়ভটষঃরসধঃব ঞৎঁঃয)দুই. তোমাদের পবিত্র করবেন; (ঈযধৎধপঃবৎ ফবাবষড়ঢ়সবহঃ/ ঈঁষঃঁৎধষ জবাড়ষঁঃরড়হ)তিন. তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তার তত্ত্বজ্ঞান; (অপধফবসরপ কহড়ৎিবফমব ধহফ চৎঁফবহপব)চার. শিক্ষা দেবেন এমন বিষয়, যা কখনো তোমরা জানতে না; (উরংংবসরহধঃরড়হ ড়ভওহভড়ৎসধঃরড়হ)এই চারটি দায়িত্বপালনের মাধ্যমেই তিনি তাঁর ওপরে যে মূল দায়িত্বটি ছিল– সকল মতবাদের ওপরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা–সেটি সম্পাদন করেছেন। এখন তাঁর উম্মত হিসেবে, তাঁর অবর্তমানে এই ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে। সে কাজটিও করতে হবে ওই চারটি দায়িত্বপালনের মাধ্যমেই। লক্ষণীয় বিষয় হলো, খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে এই ক্রমতালিকায়। সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য এ শিক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই তা সমান গুরুত্বপূর্ণপরিবর্তনকামী প্রতিটি মুসলমানের জন্যও ।প্রথম দফাটিতেই বলে দেওয়া হয়েছে, সমাজবাসীকে জানিয়ে দিতে হবে চূড়ান্ত সত্যের কথা। তারা মানুক বা না মানুক, তাদের কাছে চূড়ান্ত লক্ষ্যটি স্পষ্টভাবে ঘোষিত থাকতে হবে। তাদের অনুসৃত জীবন ও সমাজের রীতিনীতির বিপরীতে চূড়ান্ত ও সত্য রীতি কোনটি, সে বিষয়ে কোনো গোপনীয়তা বা ধোঁয়াশা থাকবে না ।দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে, ব্যক্তিমানসকে পবিত্র করা। এটা স্পষ্ট, সহজ ও সরল নির্দেশনা। ব্যক্তির চিন্তামানসকে অস্পষ্টতা, দোদুল্যমনতা, হীনম্মন্যতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা ও রাখা। তার চিন্তা ও কর্মে যত রকম দূষণ রয়েছে, তার সংশোধন ও পরিশুদ্ধতা। এটা সুস্পষ্টভাবে একটি গতিশীল, কার্যকর ও শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেই নির্দেশ করে ।তৃতীয় ধারাটিতে তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি এখানে সুস্পষ্ট। একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ধারা থাকতে হবে। সমাজের দায়িত্বশীলরা এটা নিশ্চিত করবেন, এর পাশাপাশি প্রতিটি সচেতন ব্যক্তিও নিজ নিজ উদ্যোগ ও প্রয়োজনে শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হওয়ার চেষ্টা করবেন।আর সর্বশেষ এবং চতুর্থ ধারাটি হলো–সমাজের ভেতরের হোক বা বাইরের কোনো মহল থেকে হোক, সমাজ বদলের এই প্রচেষ্টার ব্যাপারে যেকোনো ধরনের নেতিবাচক প্রচার-প্রোপাগান্ডা মোকাবিলা করতে হবে। তদস্থলে প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে হবে এবং নিজেদের দর্শন প্রচারে একটি কার্যকর, ইনফরমেশন সিস্টেম গড়ে তোলা জরুরি।এই চারটি মৌলিক কর্মপদ্ধতিতে দৃষ্টিসীমা রেখেই এই একবিংশ শতাব্দীর মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি প্রণয় করে নিতে হবে। আর সেজন্য প্রথম যে কাজটি করে নিতে হবে, তা হলো চিন্তার পুনর্গঠন।

চিন্তার পুনর্গঠন'চিন্তা' (এঃযড়ঁমযঃ);

আরবিতে 'ফিকর'। ছোট্ট শব্দটির পরিধি মনুষ্য জীবনের চাইতেও বিশাল ও ব্যাপক। আমরা চিন্তা করি। আর এ চিন্তাই আমাদের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। চিন্তার বহিঃপ্রকাশই ঘটে আমাদের কর্মকাণ্ডে।আর এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই প্রভাবিত হয় ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্র। কখনো কখনো এ প্রভাব এতটাই ব্যাপক ও বিশাল হয় যে, তা আমাদের নিজস্ব গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে কাল থেকে কালান্তরে ।চিন্তার নানা ধরন, নানা স্তর রয়েছে। একে আমরা সৎ চিন্তা, অসৎ চিন্তা বা কুচিন্তা নামে অভিহিত করে থাকি। গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ও দার্শনিকেরা গভীর চিন্তা করে থাকেন। তাদের চিন্তাশক্তির গভীরতা অনেক বেশি। তা নির্ভর করে ব্যক্তির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বোধবুদ্ধি ও অনুভূতিশক্তির স্তরের ওপর। কাল, সমাজ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাও এক বিরাট ভূমিকা পালন করে ।মনোবিজ্ঞানীরা চিন্তার (এঃযরহশরহম) সংজ্ঞায় বলেছেন–এঃযরহশরহম সবধহং ৎবঢ়ৎবংবহঃরহম ঃযরহমং সবহঃধষষু ধহফ ড়ঢ়বৎধঃরহম সবহঃধষষু ড়হ ঃযবংব ৎবঢ়ৎবংবহঃধঃরড়হং.'চিন্তা হচ্ছে মানসপটে কোনো একটা বিষয়কে স্থির করে নিয়ে, তাকে ঘিরে মানসিক কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া।'মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়; এমনকি আন্তর্জাতিক জীবনও এই চিন্তার ওপরে ভিত্তি করেই পরিচালিত হয়। এটাই হলো বাস্তবতা। চিন্তার ধরন ও মানের ওপরে নির্ভর করেই নিরূপিত হয় জীবনের সফলতা- ব্যর্থতা। বর্তমান দ্বন্দ্বমুখর, বৈষম্যপূর্ণ বিশ্বটাও এক বা একাধিক চিন্তাধারাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন––যে বিশ্বকে আমরা সৃষ্টি করেছি, সেটা আমাদের চিন্তাধারারই ফল। আমাদের নিজেদের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন না করে এ বিশ্বকে পরিবর্তন করা যাবে না।সমস্যাটা হলো বর্তমান পৃথিবী যে চিন্তাধারার ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তা ব্যর্থ! কথাটা আমার নয়, বিশ্বের প্রখ্যাত এক দার্শনিক পণ্ডিতের। বিশ্বশ্রেষ্ঠ তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশ্বখ্যাত চিন্তাবিদ, বহু গ্রন্থের প্রণেতা প্রফেসর অ্যাডওয়ার্ড ডি বোনো তার চধৎধষষবষ ঃযরহশরহম গ্রন্থের ভূমিকাতেই লিখেছেন–"বিশ্ব যে দর্শন বা চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে চলছে, তা ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিমা দর্শনের ব্যর্থতার কারণ চিন্তাধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটিনয়; বরং এ দর্শন ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ দর্শনটির গভীরেই রয়েছে অপূর্ণাঙ্গতা। এ দর্শনের প্রক্রিয়াতেই মিশে রয়েছে এর বিপদ।' এ দর্শনের ভেতরেই যে লুকিয়ে রয়েছে ব্যর্থতার কারণ, তা জানিয়ে লিখেছেন– 'অথচ দ্রুত পরিবর্তনশীল এ বিশ্বে প্রচলিত চিন্তাধারাটি ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ, তা যুগ ও সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারছে না। পুরো চিন্তাধারাটিই অপূর্ণাঙ্গ, এটি ভীষণ বিপজ্জনকও আত্মতুষ্টিমূলক!'অর্থাৎ আধুনিক যেসব চিন্তাধারা বিশ্বে প্রচলিত, সেগুলোর মধ্যে যুগের পরিবর্তনকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি নেই। তবে ইসলামি দর্শনের এই শক্তিটা রয়েছে। এটা ইজতিহাদ। ইজতিহাদের ব্যবস্থা রয়েছে বলেই ইসলাম কখনোই পুরোনো হয় না। পরিবর্তিত প্রতিটি যুগ ও পরিস্থিতিতেও ইসলাম সর্বাধুনিক একটি মতবাদ হিসেবে থেকে যায়।এর কারণ হলো, ইসলাম ব্যক্তিকে চিন্তা করতে বলে। বলে, আফালা তাতাফাক্কারুন? আফালা তাদাব্বারুন? এই যে স্বাধীন চিন্তা করতে পারা, এটা ব্যক্তিমানসে জ্ঞানের ধারা উন্মোচনের পূর্বশর্ত। ইসলাম হুদুদ নির্ধারণ করে দিয়ে বলে, তোমার ইচ্ছামতো চিন্তা করো এবং কুরআনে বর্ণিত পন্থার সাথে সংগতি রেখে চলো, তাহলে তুমি চূড়ান্ত জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান পাবে।এই চূড়ান্ত সত্যকে জানার কিংবা খুঁজে বের করার পথেই মানুষ চিন্তার একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরে উন্নীত হতে থাকে। সে তার নিজের মনেই উদিত চিন্তাকে নিজেই যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করে। একসময় তার কোনো একটিকে গ্রহণ বা বর্জন করে।মুসলিম জাতির পিতা, সম্মানিত নবি ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনেই এর উদাহরণ রয়েছে। আল কুরআনে সেটা সংক্ষিপ্ত হলেও খুব সুন্দরভাবেই বিবৃতহয়েছে। বলা হয়েছে–"স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম পিতা আজরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে করো? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট। আমি এরূপেই ইবরাহিমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম–যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়।অনন্তর যখন রজনির অন্ধকার তার ওপর সমাচ্ছন্ন হলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল, হে আমার প্রতিপালক! অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন বলল, আমি অস্তগামীদের ভালোবাসি না।অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল–এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল. তখন বলল–যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথপ্রদর্শন না

করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তহয়ে যাব ।অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, বলল–এটি আমার পালনকর্তা!এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল–হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়কে শরিক করো, আমি ওসব থেকে মুক্ত। আমি একমুখী হয়ে আমার সকল মনোযোগ ওই সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমণ্ডল ওভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই। এই যে কল্পনার উদ্রেক, তার পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তির উপস্থাপনা এবং পরিশেষে মনে জাগ্রত হওয়া কল্পনার অসারতা উপলব্ধি হওয়া। তারপর তা বর্জন করার প্রক্রিয়া হিসেবে চূড়ান্ত সত্য ও জ্ঞানের জন্য আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করা। আর তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশিত ও জ্ঞানকেই চূড়ান্ত জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য এই মানসিক প্রক্রিয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।আধুনিক বিশ্বের দৃষ্টিতে সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে বরিত ও স্বীকৃত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন অমুসলিম হয়েও এ সত্যটা বুঝতে পেরে বলেছিলেন-ওসধমরহধঃরড়হ রং সড়ৎব রসঢ়ড়ৎঃধহঃ ঃযধহ শহড়ষিবফমব. ঋড়ৎ শহড়ষিবফমব, রং ষরসরঃবফ, যিবৎবধং রসধমরহধঃরড়হ বসনৎধপবং ঃযব বহঃরৎব ড়িৎষফ, ংঃরসঁষধঃরহম ঢ়ৎড়মৎবংং, মরারহম নরৎঃয ঃড় বাড়ষঁঃরড়হ. ‘জ্ঞানের চেয়ে চিন্তা-কল্পনা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান তো সীমিত, কিন্তু কল্পনার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই; পুরো সৃষ্টিজগৎকেই ধারণ করে সে জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি ঘটায়, নতুন তত্ত্বের জন্ম দেয়।’বিশ্বে চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, ইসলামি দর্শন ছাড়া সেই শূন্যতা পূরণের কোনো পুঁজিই কারও কাছে নেই ।মুসলিম যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের এটা এক বিরাট সুযোগ। পশ্চিমা চিন্তকদের বেঁধে দেওয়া কাঠামোগত গণ্ডির বাইরে এসে চিন্তা ও জ্ঞানের চর্চা করা উচিত। বিশ্বের বুকে বিরাজমান ও প্রচলিত প্রতিটি মতবাদ, দর্শন ও শিক্ষার প্রতিটিকেইকুরআনের চিন্তা ও দর্শনে যাচাই করে নিতে হবে। আর তাহলে কুরআনের চিন্তাদর্শনকে তুলে ধরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতে হবে ।মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের পথে চিন্তার পুনর্গঠনে অনতিবিলম্বে প্রাথমিক এ পদক্ষেপটা নিতেই হবে। বিদ্যমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এটাই যুগের সবচেয়ে বড়ো চাহিদা। তবে এ কাজটি করতে হবে প্রজ্ঞার সাথে।

সূরা আন-আম : ৭৪-৭৯।

প্রজ্ঞা

মনে রাখতে হবে, সমাজ বদলায় সময়োচিত প্রাজ্ঞ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপে, আবেগে নয়। একটি ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে।উমর (রা.)-এর সময়কালের ঘটনা (৬৩৮-৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)। একাধারে বেশ কয়েক মাস অনাবৃষ্টি ও প্রচণ্ড খরার ফলে মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খরার কারণে মরুময় মাঠে উট, ভেড়া আর দুম্বার খাবার মতো ঘাসের পাতা ছিল না। মদিনার নিকটবর্তী অঞ্চল ও আশপাশের এলাকাতেও তার প্রভাবে ফসল আশানুরূপ হয়নি।মোটকথা, খরার কারণে দুর্ভিক্ষ প্রায় অবধারিতভাবেই এসে উপস্থিত। মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। খাদ্যাভাবে মক্কা-মদিনার উপকণ্ঠে যেসব মুসলমান তারাও বসবাস করতেন, যেসব বেদুইন দূরদূরান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতেন, এক এক করে রাজধানী মদিনায় এসে হাজির। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মদিনার জনসংখ্যা বেড়ে গেল অবিশ্বাস্যভাবে!উমর (রা.) ত্বরিত প্রশাসনিক উদ্যোগ নিয়ে সিরিয়া, মিশর ও ইয়েমেন থেকে খাদ্যসামগ্রী আনার ব্যবস্থা করলেন। তিনি সেসব অঞ্চলের শাসকদের কাছে নির্দেশসহ দূত পাঠালেন, তারা যেন যত দ্রুত সম্ভব চাহিদামতো শস্যসামগ্রীর চালান মদিনায় প্রেরণ করেন।আবার একই সাথে তিনি ইসলামি খিলাফতের প্রতিটি আঞ্চলিক শাসক বা গভর্নরদের নিকট একটা ফরমান জারি করে পাঠালেন। উক্ত ফরমানে তিনি পরবর্তী নির্দেশ জারি না করা পর্যন্ত চুরির অপরাধ হিসেবে কুরআনে বর্ণিত ও নির্দেশিত চোরের হাত কাটার শাস্তি স্থগিতের আদেশ দিলেন।

'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। অতঃপর যে তাওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা মাইদা : ৩৮ ও ৩৯)

আল কুরআনের অকাট্য এই নির্দেশটিকেই তিনি সাময়িকভাবে স্থগিত করার হুকুম জারি করলেন। নির্দেশটি জারি করার সময়কালটা এবং তার তাৎপর্য করাটা একজন মুসলমান হিসেবে বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের জন্যই জরুরি।প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথে আল্লাহর নিকট থেকে ওহি আসা বন্ধ হয়ে গেছে চিরস্থায়ীভাবে। আর আল কুরআনও ততদিনে পরিপূর্ণভাবেই নাজিল হয়ে গেছে। এই আল কুরআনে কোনো কিছুই সংযোজন বা বিয়োজন করার কোনো রাস্তা আর খোলা নেই।ঠিক এ রকম অবস্থায় চোরের হাত কাটার শাস্তি হিসেবে নির্দেশিত আল্লাহর হুকুমকে সাময়িকভাবে স্থগিত করার ঘোষণা জারি করলেন, তাও আবার সরকারিভাবে, লিখিত নির্দেশ আকারে! তখনও উসমান, আলি, আবদল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা.) এবং উম্মাহাতুল মুমিনিনসহ লক্ষাধিক সাহাবি, হাজার হাজার তাবেয়ি বেঁচে আছেন।অবাক করার ব্যাপার হলো, উমর (রা.) কুরআনে স্বয়ং আল্লাহর কর্তৃক নির্দেশিত একটা হদ সাময়িকভাবে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করতে বললেন, অথচ এইসব সম্মানিত সাহাবির একজনও এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি।এর কারণ কী? এর কারণ হলো, তাঁরা প্রত্যেকেই কুরআনের যথাযথ শিক্ষাকে পুরোপুরিভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। ইসলামি রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে বাধ্য। যদি কোনো রাষ্ট্র কোনো কারণে সে প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয় এবং মৌলিক প্রয়োজন না মেটার কারণে কোনো নাগরিক জীবন বাঁচাতে অন্যায় করেও ফেলে, তবে রাষ্ট্র তার ওপর মৃত্যুদণ্ড বা হাত কাটার মতো কঠোর শাস্তিগুলো কার্যকর করতে পারে না।

যুগের ভাষা বুঝুন

একটি উদাহরণ তুলে ধরলে বুঝতে সুবিধা হবে। কুখ্যাত ফেরাউনের-শাসনকাল। পাপাচারে আকণ্ঠ নিমগ্ন মিশরীয় সমাজ। জুলুম ও নির্যাতন,শোষণও বঞ্চনা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত। ঠিক তখন আল্লাহ তায়ালা নবি মুসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন ফেরাউনের নিকট গিয়ে সত্য, সুবিচার ও সাম্যের দাওয়াত দেওয়ার।বিগত দিনে ওই সমাজ থেকেই মুসা আলাইহিস সালাম নিজের প্রাণ বাঁচাতে ফেরারি হয়েছিলেন। তিনি ভয় পেলেন। সে ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে অজুহাত দাঁড় করালেন। ভাষার ক্ষেত্রে নিজের দুর্বলতাকেও উল্লেখ করলেন। বললেন, আমার জিহ্বায় জড়তা রয়েছে। আত্মবিশ্বাসে, সাহসে ঘাটতি রয়েছে উল্লেখ করে বললেন-'এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহ্বা অচল হয়ে যায়। সুতরাং হারুনের কাছে বার্তা প্রেরণ করুন। আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।[১১৪]অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে বিকল্প প্রস্তাবনায় তাঁরই ভাই হারুন (আ.)-কে যেন পাঠানো হয়, সে কথা বললেন। আল্লাহ পাক সোজাসাপ্টা তাঁর সকল অজুহাত বাতিল করে বললেন–"কখনোই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলি নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শুনব ।'[১১৫]অর্থাৎ তিনি তাঁদের উভয়কেই পাঠালেন এ মিশনে। আর একই সাথে মুসা (আ.)-কে আশ্বস্ত করে জানালেন, মুসা ও তাঁর ভাই হারুন একা নন; আল্লাহনিজেই তাঁদের এ মিশনে সাহায্য করবেন। ফেরাউন তাঁদের কোনো ক্ষতিকরতে পারবে না ।প্রতিটি সমাজের মতো মিশরের জনগণও ফেরাউন ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ তথা নীতিনির্ধারকদের দক্ষতা ও পারঙ্গমতায় বিমোহিত ছিল। তাদের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র ছিল জাদুবিদ্যা। তারা সাধারণ বুদ্ধি ও স্বাভাবিক চিন্তার বিপরীতে এমন সব কাজ করতে পারত, যা দেখে জনগণ তাদের শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহে পড়ে যেত, বিমোহিত হয়ে তার আনুগত্য করত।এমন শক্তিধর শাসক ও সুশীল সমাজের সামনেই মুসা ও তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে যেতে হলো নির্দেশিত হয়ে।সত্য ও সুন্দরের আহ্বান পেয়ে অহংকারে জ্বলে উঠল দাম্ভিক ফেরাউন। মুসা ও হারুন (আ.)-এর আহ্বান ও শক্তি-সামর্থ্যকে তুচ্ছতার সাথে উড়িয়ে দিলো মিশরের সবচেয়ে শক্তিশালী সুশীল সমাজ বুদ্ধিজীবীদের (শৈল্পিক জাদুকর) ডেকে জড়ো করল। শক্তির মহড়া দেখতে সে মিশরের তাবৎ জনগণকেও হাজির করল।সে যুগের সবচেয়ে বড়ো ট্রেন্ডকে মোকাবিলা করতে আল্লাহ তায়ালাও যুগোপযোগী অস্ত্রই দিলেন মুসা (আ.)-কে। তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করামাত্রই জীবন্ত সাপ হয়ে গেল। বগলে জামার আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে বের করামাত্রই তা থেকে বিচ্ছুরিত হলো উজ্জ্বল আলো। উপস্থিত সুধী ও সুশীল সমাজ এবং মিশরীয় জনগণের জন্য তা ছিল এক দারুণ উপভোগ্য দৃশ্য!ঠিক তেমন বাস্তবতা আজও বিরাজমান। আধুনিক যুগে শাসকশ্রেণির সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র কী? নানা চেতনা ও মতবাদকে যুক্তির সাহায্যে টিকিয়ে রাখা। আর অযৌক্তিক সেসব যুক্তিকে টিকিয়ে রাখতে মিথ্যা-শঠতা-ছলনা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া। সমাজের সুশীল শ্রেণিও এইসব মিথ্যা ও শঠতাকে চেতনার নামে, মতবাদের নামে টিকিয়ে রাখে বা রাখতে সরকারকে সহায়তা করে।মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও এসব যুক্তি ও মতবাদ কেন টিকে আছে? কেনই-বা টিকে থাকে? টিকে থাকার কারণ, আমরা যুগের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র জ্ঞান আর তথ্য, সাহিত্য আর যুক্তি তথা যুগের ভাষা বুঝতে পিছিয়ে পড়েছি। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো পশ্চাৎপদতা।অন্য সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণও এটিই। এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো একটি শক্তিশালী চিন্তামানস তৈরি করা।যুগের ভাষা বুঝতে পারলেই চিন্তা একটি সঠিক দিকনির্দেশনা পায়। যুগোপযোগী গতি পায়। এটা অর্জনের একমাত্র কার্যকর এবং ইসলামেরনির্দেশিত কার্যকর পথ হলো–আল কুরআন বুঝে পড়া। আর তা পড়ে পড়ে বোঝা। কুরআনের চিন্তাধারাকে ধারণ এবং চিন্তা করতে শেখা।

সূরা শু'আরা : ১৩-১৪
সূরা শু'আরা : ১৫

আত্মপরিচয়

আল কুরআনের চিন্তাধারা তার ধারককে আত্মপরিচয় দান করে। আত্মপরিচয় একজন মুসলমানকে প্রচণ্ড শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলে। ইতিহাসে একটি চমকপ্রদ ঘটনা রয়েছে আমাদের জন্য। বিশেষ করে মুসলিম চিন্তামানসের জন্য তা খুবই প্রাসঙ্গিক।ইয়েমেনের রাজা একটা মূল্যবান গাউন নবিজিকে উপহার দেন। নবিজিও উপহারটি গ্রহণ করছিলেন। একবার সেটা গায়ে দিয়ে খুতবাও দিয়েছিলেন। হাকিম ইবনে হিশাম (রা.) বলছেন, এ গাউনে তিনি মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো সুন্দর ও স্মার্ট আর কাউকে দেখেননি ।একদিন সাহাবি হাকিম (রা.) (তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) মদিনার রাস্তায় উসামা বিন জায়েদ (রা.)-কে সেই গাউনটি পরা অবস্থায় দেখলেন । উসামা (রা.) ছিলেন নবিজির দাস জায়েদ বিন হারিসা (রা.)-এর সন্তান।উসামা বিন জায়েদ (রা.)-এর গায়ের রং ছিল কালো, চ্যাপ্টা নাক এবং চিকন ঠোঁট। দেখতে সুশ্রী ছিলেন না তিনি। একজন নিগ্রো দাসের গায়ে ইয়েমেনের রাজার সেই গাউন দেখে হাকিম (রা.) খুব অবাক হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি উসামা না? তুমি সেই গাউন পরেছ, যেটা ছিল ইয়েমেনের রাজা জিয়াজানের? প্রিয়নবির ঘরে তাঁরই কাছে প্রশিক্ষিত নিগ্রো ও দেখতে অসুন্দর উসামা (রা.) ওই প্রশ্নের চমৎকার জুতসই জবাব দিলেন। বললেন–'আল্লাহর কসম! আমি ইয়েমেনের বাদশার চেয়েও শ্রেষ্ঠ (ওআল্লাহি আনা খাইরুম মিন জিয়াজান) আমার বাবা জিয়াজানের বাবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমার মা জিয়াজানের মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ আমি, আমার বাবা, আমার মা, আমরা সকলেই পড়েছি–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!”সে যুগে ইসলাম সমাজের সবচেয়ে হতদরিদ্রদের মধ্যেও এমন আত্মসম্মানবোধ জাগিয়েছিল! এই আত্মসম্মানবোধ, আত্মপরিচয়ই সাহাবি এবং তাঁদের বংশধর মুসলমানদের এ রকম প্রচণ্ড শক্তিশালী ও অপরাজেয় করে তুলেছিল।দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো, আত্মপরিচয় হারানোর কারণে আজ আমাদের মনে আত্মসম্মানের লেশমাত্র নেই! আমরা বিধর্মীদের কাছে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য মুখিয়ে থাকি। সম্মান ও মর্যাদা পেতে বোধে ও বিশ্বাসে, শিক্ষা ও দর্শনে, কৃষ্টি ও কালচারে, চলনে ও বলনে তাদের সাথে মিশে যেতে চাই।এটি একটি আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মাধ্যমে যেসব মুসলমান বিশ্বের বুকে নিজেদের মর্যাদা ও আসন খুঁজেছেন, তারা তা পাননি। আর কোনো দিন পাবেনও না। আমাদের সামনেই তার উদাহরণ রয়েছে।প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার অংশে (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনিয়া) বসবাসরত মুসলমানরা আধুনিকতা, তথাকথিত ইউরোপীয় প্রগতিবাদিতা, সহাবস্থান ও সেক্যুলাজিমের চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন খুব ভালো করেই। চালচলনে, কথাবার্তায়, আচারে-আচরণে, বোধে-বিশ্বাসে, পোশাকে-পরিচ্ছদের কোনো দিক বিচারেই তাদের মুসলমান বলার কোনো পথ ছিল না (দু-একটা ব্যতিক্রম বাদে)।তারা নিজেদের যতটা গর্বের সাথে ইউরোপীয় হিসেবে পরিচিত করতে চাইত, তার মুসলমান হিসেবে পরিচিত করানোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। বিবাহপূর্ব যৌনতা, বিবাহ ছাড়াই সন্তান ধারণ, মদপান, মাদক সেবন, জবাই না করেই মাংস খাওয়া, শূকরের মাংস খাওয়া, খ্রিষ্টান সার্বদের সাথে অবলীলায় বসনীয় নারীদের বিবাহ কিংবা লিভ টুগেদার–কোনোটাতেই তাদের কোনো রকম আপত্তি ছিল না ।কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে স্বাধীনতার প্রশ্ন থেকে যে সংঘাত এবং পরিশেষে যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তাতে পুরো ইউরোপ; এমনকি পুরো বিশ্বের চোখের সামনে নিরস্ত্র বসনীয়দের ওপরে জঘন্য হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। প্রকাশ্যে হত্যা করা হয় অন্তত ৮০০০ মুসলমান নরনারীকে।এই বর্বরতা চালানোর সময় সার্ব খ্রিষ্টানরা তাদের ব্যক্তিজীবনে ইসলাম আছে কী নেই, সেটা দেখেনি ।তার মানে হলো–জীবন, বোধ-বিশ্বাস, নীতি-আদর্শ এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনধারার সাথে আপস করে নিজেদের পৃথক জাতিসত্তাকে বিসর্জন দিয়েও বসনীয় মুসলমানরা সার্বীয় খ্রিষ্টানদের কাছে 'আপন' হতে পারেনি!একই ঘটনা ঘটেছিল স্পেনেও। কর্ডোভার পতনের পরে সেখানে থেকে যাওয়া মুসলমানদের জোর করে খ্রিষ্টান বানানো হয়। ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত এইসব খ্রিষ্টান এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম খ্রিষ্টান হওয়া সত্ত্বেও কেবল একসময় তারা নিজেরা কিংবা তাদের বাপ-দাদারা মুসলমান ছিল–এই অপরাধে ফার্ডিনান্ডের স্পেনে তাদের আলাদা নামকরণ করা হয় 'মরিস্কো' হিসেবে।'মরিস্কো'-দের ঘৃণার চোখে দেখার পাশাপাশি ব্যাবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, চাকরিবাকরিতেও কোণঠাসা করে রাখা হয়। তাদের বাধ্য করা হয় আলাদারঙের পোশাক পরতে। সন্দেহ হলেই ইনকুইজিশনের আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। সহাবস্থানের নামে ধর্ম ও কৃষ্টি বিসর্জন দিয়েও তারা রক্ষা পায়নি। ইতিহাস বলে,

আত্মপরিচয় বিসর্জন দিয়ে সহাবস্থান সম্ভব নয়। আত্মরক্ষাও হয় না। আপনি নিজের পরিচয়ে নিজের সম্মানজনক অবস্থান ও মর্যাদা নিয়েই বাচুন। মানবিক মর্যাদা বজায় রাখতে ও পেতে আপনাকে বা যেকোনো ধর্মেরই যেকোনো ব্যক্তিকে তার ধর্মবিশ্বাস বিসর্জন দিতে হবে, সেটা কাম্য নয়। একজন মানুষ হিসেবে তিনি মর্যাদাবান কেবল মানুষ হওয়ার কারণেই।আর মানবজাতির মধ্যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকৃত একজন মুসলমান বিশ্বের অন্য যেকোনো মানুষের চেয়ে বিশেষ মর্যাদাবান। কারণ, তিনি বিশ্বের বুকে আল্লাহর খলিফা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গর্বিত উম্মত। আল্লাহ তাকে ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন।অর্থাৎ একজন মুসলমান ইসলামের কারণেই সম্মানিত ও শক্তিশালী। ইসলামি চিন্তা, দর্শন, শিক্ষা ও আচরণের কারণেই তার এই বিশেষ মর্যাদা। কাজেই বিশ্বকে পরিবর্তন করতে চাওয়া মুসলমানকে ইসলামের সেই চিন্তা ও দর্শনকেই অবিকৃতাবস্থায় ধারণ করতে হবে। আর সে লক্ষ্য অর্জনে প্রকৃত অর্থেই ধর্মাশ্রয়ী হতে হবে।

অতএব ধর্মাশ্রয়ী হোন

একবিংশ শতাব্দীর মানুষ ধর্মকে নিজেদের জীবনে গৌণ বা অপ্রয়োজনীয় করে নিয়েছে। দুঃখের বিষয় হলো, পশ্চিমা সমাজ বলতে আমরা যে খ্রিষ্টবাদী সমাজকে চিনি ও জানি, তারা সেটা করেছে। কিন্তু তাদের সাথে সাথে মুসলিম সমাজের একটা বিরাট অংশও তা করেছে। এই উভয় গোষ্ঠীই অতিমাত্রায় বিজ্ঞাননির্ভরতার কারণে চিন্তার বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত।বিশেষ করে আধুনিক মুসলিম সমাজ বিজ্ঞান ও তথাকথিত বিজ্ঞাননির্ভর নানা মতবাদের কারণে চিন্তা-দূষণে আক্রান্ত হয়েছে। তারা নিজেদের জীবনে ধর্মকে হয় পরিপূর্ণরূপেই অপাঙ্‌ক্তেয় করে নিয়েছে, নয়তো আংশিক অথবা একধরনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দোদুল্যমানতায় নিপতিত হয়েছে।ঠিক এ কারণেই আমরা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞান–এ বিষয়গুলো কী এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কই-বা কী, সেটা দেখব।ধর্ম হলো মানুষের জন্য তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দেওয়া জ্ঞানের নাম হলো ধর্ম। অথবা অন্যভাবে বললে বলতে হয়, মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের একগুচ্ছ বিধিমালাই ধর্ম।জবষরমরড়হ রং ঃযব ঢ়ৎড়ফঁপঃ ড়ভ পবৎঃধরহ ঃঁৎহ ড়ভ রহঃবৎধপঃরড়হ নবঃবিবহ সধহ ধহফ যরং বহারৎড়হসবহঃ.'মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক ও সার্বিক পরিবেশের মধ্যে বিশেষায়িত আচরণ ও কর্মপদ্ধতির নামই হলো ধর্ম।'জন্মের সাথে সাথে অস্তিত্বের অংশ হিসেবেই মানুষকে তার ধর্মের প্রাথমিক জ্ঞান তথা নীতিনৈতিকতা, ভালো-মন্দের প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

আল কুরআনে এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে–'(সৃষ্টির পর) তাকে ভালো-মন্দের জ্ঞান দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'অন্যত্র বলা হয়েছে–'তাকে কি (অর্থাৎ সৃষ্টির পরে মানুষকে) ভালো-মন্দ দুটি পথই স্পষ্ট করে দেখাইনি? 'আবার আরেক জায়গায় খুব অকাট্যভাবে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে–তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই । এটাই সরল ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। সূরা রুম : ৩০

অর্থাৎ জন্মের সাথে সাথে অস্তিত্বের অংশ হিসেবেই মানুষকে তার ধর্মের প্রাথমিক জ্ঞান তথা নীতিনৈতিকতা, ভালো-মন্দের প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় চেতনা ও জ্ঞান মানুষ তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য হিসেবেই পেয়ে থাকে। ফলে এটা অনস্বীকার্য, ধর্ম মানুষের জন্মগত অস্তিত্বের অংশ। এটাকে জোর করে অস্বীকার করলেও তাতে সত্য পালটায় না।এক আমেরিকান সাইকোলোজিস্ট (মনোবিজ্ঞানী) ধর্মকে অস্বীকার করেদ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন-ঝপরবহপব যধং ংযড়হি ৎবষরমরড়হ ঃড় নব যরংঃড়ৎু'ং পৎঁবষবংঃ ধহফরিপশবফবংঃ যড়ধী."বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, ধর্ম হলো ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ওনিকৃষ্টতম ভণ্ডামি ।'[১১৭]একজন সচেতন মুসলমান ইচ্ছা করলে এই বিজ্ঞানীদের নিজেদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকেই তাদের ধর্ম কী জিনিস, সেটা বুঝিয়ে দিতে পারেন। তেমনই একটা ঘটনার কথা বলছি আমরা।উদাহরণ হিসেবে সবচেয়ে সহজলভ্য মুরগির ডিমের কথাই ধরুন। প্রায় ৪০ ধরনের বিভিন্ন প্রোটিনসহ মিনারেলস, ঠরঃধসরহ অ, উ, চযড়ংঢ়যড়ৎঁং, ঈধষপরঁস, এঁযরধসরহব ও জরনড়ভষধারহ ভিটামিন যেমন আমাদের পুষ্টি ও শক্তি জোগায়, তেমনই তা থেকে মুরগির

বাচ্চাও জন্ম নেয়। নরম তুলতুলে মুরগির বাচ্চাকে আমরা অনেরকেই হাত দিয়ে ছুঁয়ে ধরতে পছন্দ করি। কারণ, তার কোমলতা, গায়ে হালকা পশমের মসৃণতা আমাদের আকৃষ্ট করে।দীর্ঘ ২১ দিন তা দেওয়ার পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর গর্ভাশয়ে বাচ্চা বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তারা মায়ের শরীর থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টির সরবরাহ পেয়ে পরিপুষ্ট হতে থাকে। কিন্তু মুরগিসহ এ রকম অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে তা হয় না। মায়ের শরীরের সাথে তার কোনো সংযোগ না থাকায় বেড়ে ওঠার জন্য সেখান থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও রসদ পাওয়ার তার আর কোনো সুযোগ নেই।কিন্তু তারপরও তা বেড়ে ওঠে, একটা পরিপূর্ণ প্রাণের রূপ লাভ করে। আরও অবাক ব্যাপার হলো, এই সেই তরল কুসুম আর অ্যালবুমিন (ডিমের ভেতরে সাদা তরল অংশটুকু); তার ভেতর থেকেই একটি প্রাণ তৈরি হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে! কোথায় যেন একটা পর্দা রয়েছে, ফলে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না!কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন—'যারা কুফরি করে, তারা কি ভেবে দেখে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলামএবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে, তবুও কি তারাঈমান আনবে না?'[১১৮]আল্লাহ তায়ালা ডিমের মধ্যে সেই পানি মজুদ রেখেছেন। আর সকল প্রাণের মৌল হচ্ছে যে প্রোটিন, সেই প্রোটিনও রেখেছেন ডিমের মধ্যে।ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের তৈরি ডিমের খোলসের গায়ে প্রায় ১৭ হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে। খালি চোখে দেখতে না পাওয়া এই ছিদ্রগুলো দিয়ে ডিমের মধ্যে আলো ও আর্দ্রতা ঢুকলেও কোনো ধুলোবালি ও রোগজীবাণু ঢুকতে পারে না। কারণ, দুই স্তরবিশিষ্ট এই খোলসের মধ্যে রয়েছে আরও একটা সূক্ষ্ম পর্দা; রুম (ইষড়ড়স), যা ডিমের ভেতরে প্রাণের মৌল উপাদান পানি ও প্রোটিনকে যেকোনো জীবাণুর আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে।২১ দিন তা দেওয়ার ধারাবাহিকতায় এর ভেতরে আমাদের অলক্ষ্যেই একটা প্রাণ; মুরগির বাচ্চা জন্ম নেয়। নরম ও দুর্বল বাচ্চাটা একসময় ভেতরেই নড়াচড়া করতে থাকে। মানুষের হাতে, তার শক্তির কাছে ডিমের বাইরের খোলসটা যতই দুর্বল ও ভঙ্গুর বলে মনে হোক না কেন, ভেতরের ওই বাচ্চাটার কাছে তা এক দুর্ভেদ্য দুর্গ বটে!প্রশ্ন হলো, অতি দুর্বল এই সত্তার কাছে ডিমের খোলস ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসার তাগাদা দেয় কে? খোলস ভাঙার মতো শক্তিই-বা তাকে কে জোগায়; তাও আবার এই ২১তম দিনেই!আগে ভাবা হতো, ডিমের ভেতর থেকে বাচ্চা বেড়ে ওঠায় ক্রমবর্ধিষ্ণু চাপে খোলসটা ভেঙে যায়। কিন্তু আধুনিক এক্সরে ও মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষায় তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বায়োলজিস্ট ও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ২১তম দিনে ডিমের ভেতরে মুরগির বাচ্চার ঠোঁটে একধরনের শক্ত সুচালু শুঁড় (ইবধশ) গজায়। এই শুঁড় গজানোর সাথে সাথে বাচ্চাটা ভেতর থেকেই ডিমের খোলসটাতে আঘাত করতে থাকে।প্রশ্ন হলো, আঘাত করে ভেতর থেকে খোলস ভেঙে বেরোনোর তাড়া সে কোথা থেকে পায়? কে তাকে ইলহাম করে জানায় যে, এখান থেকে বেরুলেই সে বিশাল ও বিস্তৃত এক বিশ্বের সন্ধান পাবে!বিজ্ঞানীরা প্রশ্নটির উত্তর দিতে অপারগ। তারা একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরও দশটা প্রশ্নের মুখোমুখি হন। তারা খুঁজতে গিয়েছিল ডিমের ভেতর থেকেজবাব দিতে গিয়ে আরও একটা কঠিন প্রশ্ন তুলে ধরেছে—মুরগির বাচ্চার মুখে বাচ্চাটা কীভাবে বেরিয়ে আসছে। মাইক্রোস্কোপ আর এক্সরে মেশিন প্রশ্নটির২১তম দিনে শুঁড় তৈরি করেন কে?বিজ্ঞানীরা লা জওয়াব! কেউ একজন আছেন নিশ্চয়। তাদের ভণ্ডামি ধরা পড়ে যায়। এটা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, বিজ্ঞানীদের ওপরেও একজন বিজ্ঞানী রয়েছেন; যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর কৌশল লুকিয়ে রেখেছেন, সেটাই বিজ্ঞান। কাজেই বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসেবে এসব সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেআমরা বলতে পারি—ঞযব পড়হংঃবহঃ ড়ভ ংপরবহপব রং ঃযব ঢ়ধঃঃবৎহ অষষধয যধং রসঢ়ষধহঃবফ রহপৎবধঃরড়হ.সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ যে নিদর্শন, কৌশল ও উপাদান রেখেছেন, সেটাই বিজ্ঞান।'যারা সেই কৌশলকে সার্থক ও সফলভাবে খুঁজে বের করতে পারেন, তারাই বিজ্ঞানী। আর যে সুসংগঠিত পদ্ধতিতে সেই কৌশলকে খুঁজে বের করা হয়, সেটা হলো গবেষণা বা রিসার্চ। এই বিজ্ঞান হলো মানুষের, মানবসভ্যতার এবং সর্বোপরি বিশ্বের সকল সৃষ্টির কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের সব ধরনের অকল্যাণকে রোধ করতে। তাদের সকলের জীবনকে সহজ করে তুলতে।কাজেই আজ এই একবিংশ শতাব্দীর যুগকে বিজ্ঞানের যুগ হিসেবে অভিহিত করে ধর্ম ও ধর্মীয় জীবন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার যে পাঁয়তারা, তা বিজ্ঞানের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। এ রকম অপব্যবহারের মাধ্যমেই কিছু ভণ্ড বিজ্ঞানী একটা মেকি খোলস তৈরি করে নিজেদের ধর্মবিদ্বেষী মতবাদগুলোকে টিকিয়ে রেখেছে।আধুনিক বিশ্বের মুসলমান যুবমানসকে বুঝতে হবে, কুরআনের জ্ঞানকে ভিত্তি করে চিন্তার পুনর্গঠনের মাধ্যমে তারা ইচ্ছে করলেই বিজ্ঞানের

তৈরি এই মেকি খোলসটা ভেঙে ফেলতে পারে। বিশ্বব্যাপী আধুনিক চিন্তা ও মতবাদের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন খুব সহজেই। খুব সহজেই ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনভিত্তিক একটি নতুন ও সর্বজনীন ও সর্বমানবিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরতেসক্ষম হবেন। বিগত ৩০০ বছর ধরে চলে আসা ধর্ম বিমুক্তকরণের বৈশ্বিক যে কর্মকাণ্ড চলে আসছে, বদলে দিতে পারেন সে ধারাও।অবশ্য এজন্য তাদের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে–**এক.** যে ক্রমধারায় বিশ্বে ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে, সেই ক্রমধারা তথা সেই ইতিহাস জানতে হবে। আমরা আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে কিছুটা হলেও সে বিষয়ে আলোচনা করেছি ইতঃপূর্বের অধ্যায়ে।**দুই.**নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানতে হবে। তার উত্থান ও পতন পর্বের পেছনে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান কারণগুলোও জানতে ও উপলব্ধি করতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাসচর্চা করতে হবে।

সূরা

ইতিহাসচর্চা

ইতিহাস হলো জ্ঞানের তিনটি উৎসের মধ্যে অন্যতম একটি উৎস। ইতিহাসের জ্ঞান ছাড়া কেউ জ্ঞানী হতে পারে না। আবার অর্জিত জ্ঞানের মানও নির্ভর করে ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা ও তার যথার্থতার ওপরে। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে বারবার ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। আর তা দেখে মক্কার মুশরিক কাফিররা বলেছে, এ তো পুরোনো দিনের গালগল্প! অতীত দিনের আলাপন।
আল কুরআনই আমাদের সামনে তাদের সে কথা তুলে ধরেছে–'তাদের কাছে যখন আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, শুনলাম তো, ইচ্ছে করলে এ রকম কথা আমরাও বলতে পারি। এগুলো তো আগে কালের কিচ্ছা-কাহিনি ছাড়া আর কিছুই না। সূরা আনফাল-৩১
অথচ বাস্তবতা হলো, বিগত দিনের জাতিসমূহের অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল একটাই, সত্যকে অস্বীকার করার পরিণাম-পরিণতি যেন তারা বুঝতে পারে। যেন জীবন সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ কারণেই অতীত দিনের আলাপন বা গালগল্পের অবতারণা করা হয়েছে বারবার। অথচ সেটা তারা বোঝেনি বলেই সত্যপথের সন্ধানও পায়নি।আগেই বলেছি, ইতিহাস হলো শিক্ষা ও জ্ঞানের তিনটি উৎসের একটি। ইতিহাস জ্ঞান দেয়। অজ্ঞানতাকে দূর করে। চিন্তার ক্ষেত্রে বিরাজমান ভ্রান্তি অপনোদন করে স্বচ্ছতা দান করে। অথচ একদল মানুষ ইতিহাসচর্চার নামে এরই মধ্যে নিজেদের মনগড়া তথ্য ও মেকি উপাত্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইতিহাসকে প্রকৃত অর্থেই গালগল্প বানিয়ে ফেলেছে। ফলে তাদের অনুসারীসমর্থকরা ইতিহাসকে সে হিসেবেই দেখেছে। এভাবে একটা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের মন ও মননে ইতিহাস সত্যি সত্যিই 'গল্প' হিসেবেই ঠাঁই করে নিয়েছে! এ কারণেই কেউ কেউ ইতিহাস, তথা 'হিস্টোরি' (ঐরংঃড়ৎু)-কে 'হিজ স্টোরি (ঐরং ঝঃড়ৎু) বলে থাকেন। অথবা যে ঐতিহাসিক সেই ইতিহাস লিখেছেন, তার গল্প অর্থাৎ 'ঐতিহাসিকের গল্প' বলেন। ইতিহাস বলেন না।এই একটি কাজ খুব সন্তর্পণে, খুব যত্নের সাথে করা হয়েছে বিশ্ব ইতিহাস নিয়ে। আর খুবই তিক্ত বাস্তবতা হলো–ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের মধ্যে হাজার বছরব্যাপী চলমান সংঘাতে মনস্তাত্ত্বিক বিজয় নিশ্চিত করতে ইসলামের ইতিহাস নিয়েও জল কম ঘোলা করা হয়নি। বিগত ১৪০০ বছর ধরে নানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নানা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামের প্রকৃত ইতিহাসকে হয় গোপন করেছে, না হয় বিকৃতি করেছে।আর আজ এই একবিংশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সে ধারা এর আগেকার যেকোনো যুগ ও কালের চেয়ে বেগবান গতিতে চলছে। সে ধারা চলমান রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই।ভারতে বিকৃত ইতিহাসের ব্যাপারে বিশদ তথ্য-প্রমাণসহ বই লিখেছিলেন জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক গোলাম আহমেদ মোর্তজা। ইন্দিরা গান্ধি সরকার তার সেইসব তথ্য-প্রমাণকে পালটা যুক্তি দিয়ে মিথ্যা প্রমাণ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বইটা বাজেয়াপ্ত করে।ইদানীং ওই একই ভারতে মোদি সরকারও বিদ্যমান ইতিহাস বদলে নতুন করে তা লেখার উদ্যোগ নিয়েছেন। নতুন ইতিহাসে আগামী প্রজন্ম জানবে তাজমহল বাদশাহ শাহজাহান বানাননি, সেটা একটা মন্দির ছিল; কোনো এক হিন্দু রাজা- মহারাজা সেটা বানিয়েছিলেন। আর মুসলমান বাদশাহ, তস্কর শাহাজাহান সেটাকে

নিজ স্ত্রী ও তার নিজের জন্য সৌধ হিসেবে পরিবর্তিত করেছেন!এ রকম শত শত ঘটনা বদলে দেওয়া হবে সকলের চোখের সামনে। সেই ইতিহাসে কত নায়ক হয়ে যাবে খলনায়ক! কত দস্যু, তস্কর হবে নায়ক! দখলদার ইসরাইলিরাও তাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেই কেবল নয়; বরং ইহুদি নিয়ন্ত্রিত সকল মাধ্যমেই ফিলিস্তিনসংক্রান্ত ইতিহাস বদলে ফেলছে। আগামী প্রজন্ম যেদিন বা যে সময়কালে দেশ ও সমাজের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় বসবে, ততদিনে কিন্তু আমি-আপনি, আমরা কেউই থাকব না। থাকবে না নেতিনিয়াহু নিজেও। কিন্তু থেকে যাবে ইতিহাস। তবে ততদিনে অবশ্য ফিলিস্তিনের ইতিহাস, ফিলিস্তিনে মুসলমানদের ইতিহাস হয়ে যাবে; 'ঐরংঝঃড়ৎু' হয়ে যাবে নেতিনিয়াহুর ইতিহাস বা ভারতে মোদির ইতিহাস!ফিলিস্তিন বা ভারতের মুসলমানদের আগামী প্রজন্মের সন্তানরা ততদিন আত্মপরিচয়হীন একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে, কোনো জাতিকে যদি পদানত করতে চাও বা পদানত রাখতে চাও, তবে তার ইতিহাস–ঐতিহ্য বদলে দাও বা ভুলিয়ে দাও।এই মন্ত্রকে সামনে রেখেই যুগে যুগে ইতিহাস বদলে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। দূষিত ও বিকৃত বিষয় হলো ইতিহাস। সমাজ ও রাষ্ট্র, তাই বিশ্বে সবচেয়ে গৃহস্থালি বিষয়গুলো বিজ্ঞানবিষয়ক না হলেও গবেষণার মাধ্যমে তার যথার্থতা যাচাই করতে বৈজ্ঞানিক পথ ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।তাই এগুলো বিজ্ঞানবিষয়ক সাবজেক্ট না হলেও এই সাবজেক্টগুলোকে বিজ্ঞান শব্দটির সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমনঃ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি। এ রকম আরও কিছু বিষয়কে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় এবং বিজ্ঞানবিষয়ক সাবজেক্ট হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।অথচ 'ইতিহাসবিজ্ঞান' বলে কোনো সাবজেক্ট নেই। ইতিহাসের কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও পর্যালোচনা নেই। এ কারণেই বিশ্বের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই 'ইতিহাসবিজ্ঞান' নামক কোনো বিভাগ গড়ে ওঠেনি। বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা কত শ্রমে, কত কষ্টে কত শত ডিপার্টমেন্ট চালু করেছেন; তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিন্তু এই একটা বিভাগ তারা কখনোই খোলেননি। মনে রাখতে হবে, ইতিহাস বিগত দিনের সমাজ ও সভ্যতার উত্থান-পতনের একটা আয়না। মানুষ এ পৃথিবীতে যা-ই করুক, যেখানেই করুক বা যেভাবেই করুক না কেন, সেসবের কোনো না কোনো রেশ জেনে ফেলা যায়ই। নদীর তীরের বালুচরে ভেজা বালুর ওপরে রেখে যাওয়া পদচিহ্নের ন্যায় মানুষও সমাজজীবনের পরতে পরতে তার কর্মকাণ্ডের চিহ্নরেখে যায়।এগুলোকেইখুঁজে বের করতে হয়।ইতিহাস ও ঐতিহাসিক তথ্যকে পরবর্তী যুগের মানুষ বিকৃত করার কোনো ধরনের নৈতিক অধিকার রাখে না। তেমনটা করা আর কিছুই নয়; বরং তা গোপন করা সত্যের বিকৃতি সাধনেরই নামান্তর ।দুধের ভেতরে পানি মেশানো রয়েছে কি না সেটা মাপতে ল্যাক্টোমিটার নামক যন্ত্র রয়েছে। প্রতিটি স্বর্ণকারের কাছে তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি ও দক্ষতা রয়েছে সোনার ভেতরে খাদ নিরূপণের জন্য। এর বিপরীতে ইতিহাসের ভেতরে জোচ্চুরি, বিকৃতিটা মাপার কোনো পথ নেই?আছে। ইতিহাসের খাদ মাপার সবচেয়ে বড়ো মানদণ্ড আল কুরআন আর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস। কুরআন ইতিহাসগ্রন্থ নয়; ইতিহাস মাপার গ্রন্থ। পৃথিবীর বুকে যত খাঁটি ইতিহাসই হোক, যত বড়ো ঐতিহাসিকের লেখাই হোক; তা যদি কুরআন ও হাদিসের বর্ণনার সাথে না মেলে, তবে তা ইতিহাস নয়। এই সহজ কথাটাকে মনে গেঁথে নিতে হবে চিরদিনের মতো।সত্য ইতিহাসের ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখা মুসলমানদের দায়িত্ব। কারণ, তা জ্ঞানের উৎস। পানির উৎস দূষিত হতে দেওয়া যায় না জীবনের নিরাপত্তার জন্য, তেমনই ইতিহাসকেও বিকৃত হতে দেওয়া যায় না বিশ্বে সত্য, ন্যায় আর ইনসাফের রূপ ও প্রকৃতিকে অক্ষত রাখার স্বার্থেই। ইতিহাস বিকৃত হলে কেবল মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে পুরো বিশ্বমানবতাই। কাজেই এটাকে অবিকৃত রাখতেই হবে।সে ইতিহাস হতে পারে লজ্জার বা বেদনার। উত্থানের বা পতনের, আনন্দের বা দুঃখের, সম্মানের বা অপমানের, জয়ের বা পরাজয়ের। সকল ইতিহাসকে নির্মোহভাবে জানতে হবে, জানাতে হবে, এর চর্চা করতে হবে।আইরিশ কবি ও নাট্যকার অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন, 'ঞযব ড়হব ফঁঃু বি ড়িব ঃড় যরংঃড়ৎু রং ঃড় ৎবৎিরঃব রঃ.' অর্থাৎ ইতিহাসের প্রতি আমাদের একটা দায় রয়েছে, আর সেটা হলো ইতিহাসের পুনর্লিখন।মুসলমানরা জ্ঞানের ধারক-বাহক ও উপস্থাপক। তাদের উৎপত্তি ও উদ্ভবই হয়েছে বিশ্বে সত্য জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা, অজ্ঞানতাকে দূর করে বিশ্ববাসীকে সঠিক পথ দেখাতে।চেকোস্লাভাকিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট টমাস জি মাসারিক একজন খ্রিষ্টান হয়েও এ সত্যটাকে যথার্থভাবে বুঝেছিলেন। তিনি তার একটি বক্তব্যে একবার বলেছিলেন–ঊাবৎু হধঃরড়হ রং ধংংরমহবফ রঃং ৎড়ষব রহ ধ উরারহব ংপযবসব, যধং রঃং ড়হি ংঢ়বপরভরপ ঢ়ষধপব ধহফ সরংংরড়হ, রং মড়াবৎহবফ নু ধহ রফবধ ড়ৎ ধ পবহঃৎধষ সবধহরহম.

ঐরংঃড়ৎু রং সড়াবফ নু রফবধং রহ ঃযব সরহফং ড়ভ সবহ.''ঐশ্বরিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রতিটি জাতির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারণা ও লক্ষ্যভিত্তিক অবস্থান, উদ্দেশ্য ও গন্তব্য রয়েছে। আর ব্যক্তিমানসে সেই চিন্তাধারণার প্রভাবেই ইতিহাস বদলায়।[১২১]অতএব, অনেক হয়েছে। এবার আমাদের উচিত আন্তরিক তাওবাটা সেরে নতুন করে, নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করা। অনেকের মনে সংশয়-সন্দেহ আর নিরাশা আছে। আল্লাহ আমার তাওবা কবুল করবেন তো? জীবনে এত পাপ করেছি যে, তার কোনো হিসাব দেওয়া সম্ভব না। বড়ো বড়ো পাপ, কবিরা গুনাহ; একটা- দুটো নয়, শত শত; এমনকি হাজার হাজার। এত পাপ কাঁধে নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব কোন মুখে?এ ধরনের প্রশ্ন মনে উদয় হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের চিন্তা মাথায় আসা মানে হলো আমরা এখনও শয়তানের ষড়যন্ত্রের কবলেই আছি। শয়তান চাইছে না আমরা তাওবা করি। সে চাইছে না, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন আর আমরা আবারও নতুন উদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি।কারণ, আপনি-আমি অকাট্যভাবে না জানলেও শয়তান ঠিকই জানে যে, একবার যদি আমরা আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতাপের সাথে ক্ষমাপ্রার্থনা করি, চোখের অশ্রু ফেলে তার কাছে মাগফিরাত কামনা করি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। যত বড়ো গুনাহের বোঝা আমাদের ঘাড়ে থাকুক না কেন, আল্লাহ সেই বোঝা দেখেন না; বরং তিনি দেখেন অনুতাপ ও অনুশোচনার ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা কতটুকু ছিল।

আল্লাহ নিজেই কুরআনুল কারিমে আশ্বাস দিয়েছেন–'বলুন, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
সুরা জুমার-৫৩

আসুন আমরা একটা উদাহরণ দেখি। মুসা (আ.)-এর সাথে বনি ইসরাইল জাতির অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা কুরআনের পাতায় পাতায় উল্লিখিত রয়েছে। তিনি বারবার তাঁর জাতিকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন, আর বারবার তাঁর জাতি আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাঁর এবং মুসা (আ.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এক সীমাহীন ধৈর্য আর মমতা নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সম্মানিত এই নবি তাঁর জাতির পেছনে আমৃত্যু লেগেছিলেন আঠার মতো; তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে ফিরিয়ে রাখতে।বনি ইসরাইল জাতির ক্রমাগত অবাধ্যতা ও সত্য স্বীকার করে নিতে অনীহার কারণে আল্লাহ তায়ালা একবার তাদের ওপরে আজাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি খরা চাপিয়ে দিলেন। অনাবৃষ্টির কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি অতিষ্ঠ হয়ে উঠল তাদের স্বাভাবিক জীবনও। আল্লাহ ও তাঁর নবিকে মেনে নিতে অস্বীকার করলেও বনি ইসরাইল জাতির লোকজন এ রকম সময়ে ঠিকই সাহায্যের জন্য মুসা (আ.)-এর কাছেই ধরনা দিলো।একদিন জনবসতির সবাই একত্রিত হলো আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করতে। মুসা (আ.) ও অন্যরা যখন প্রার্থনা করছিল, তখন তারা অবাক হয়েলক্ষ করল, আকাশে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মেঘ অদৃশ্য হয়ে গেল এবং খরাটি আরওতীব্রতর হলো।মুসা (আ.) কে তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বললেন, বনি ইসরাইলের এই গোত্রের মধ্যে একজন পাপী আছে, যে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আল্লাহকেঅমান্য করছে। তাকে এই গোত্র থেকে আলাদা করলেই কেবল বৃষ্টি নামবে। মুসা (আ.) তখন লোকদের ডেকে বললেন–'আমাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি আছেন, যিনি ৪০ বছর ধরে আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে। সে যদি এই জনমন্ডলী থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখনই আমরা খরা থেকে মুক্তি পাব।'পাপী ব্যক্তিটি তখন সেখানেই ছিল। সে অপেক্ষা করছিল। বাম ও ডান দিক তাকিয়ে আশা করছিল, অন্য কেউ এগিয়ে যাবে; কিন্তু কেউ তা করেনি। লোকটি জানত, সে যদি জনমণ্ডলীর মধ্যে থাকে, তাহলে সবাই মারা যাবে। আর সে যদি অগ্রসর হয়, তাহলে চিরকালের জন্য অপমানিত হবেন।এ অবস্থায় সে অশ্রু বিগলিত করে প্রার্থনা করল–'হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া করুন! হে আল্লাহ! আমার গুনাহ গোপন করুন। আমাকে ক্ষমা করুন।'মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলের লোকেরা পাপী ব্যক্তিটির এগিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছিল, কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো। মুসা (আ.) আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন–'হে আল্লাহ, তুমি আমাদের বৃষ্টি দিয়ে আশীর্বাদ করেছ; যদিও পাপী ব্যক্তিটি এগিয়ে আসেনি।'আল্লাহ রব্বুল আলামিন উত্তর দিলেন–'সেই ব্যক্তিটির

অনুতাপ ও আন্তরিক তাওবার জন্যই আমি বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।'আল্লাহর নবি মুসা (আ.) স্বাভাবিক মানবিক কৌতূহলবশতই জানতে চাইলেন– ‘হে আল্লাহ, কে সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি?'আল্লাহ বললেন–'হে মুসা! আমি ৪০ বছর যাবৎ তার গুনাহ গোপন করেছি, তোমরা কি মনে করো তার অনুতাপের পরও তাকে আমি প্রকাশ করব? [১২৩]এই হলো একজন পাপীকে ক্ষমা এবং তার ইজ্জত রক্ষা করার ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ও কর্মপদ্ধতি। এটা তো গেল মুসা (আ.)-এর আমলে তাঁরই এক উম্মতের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা। আমাদের পথনির্দেশক হিসেবে যে কুরআন এসেছে, সেখানেও আল্লাহ তাওবাকারীর ব্যাপারে বলেছেন-

'যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।

সুরা ফুরকান-৭০

[৪]অতএব আসুন, আমরা মুসলমানরা আমাদের পশ্চাৎপদতার কারণগুলো খুঁজে বের করি; কোথায় কী ভুল করে চলেছি, তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখি। আর আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নতুন উদ্যমে মাঠে নামি।আমরা যদি ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনে উজ্জীবিত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার চর্চা করি, তবে নিশ্চিত, বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান ও দক্ষতা আমাদের হাতে এসে জমা হবে। আমাদের চিন্তা ও চেতনায় স্থান পাবে এক অপ্রতিরোধ্য গতিময়তা। এটি আমাদের আবারও সেই প্রথম যুগের মুসলমানদের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য হিসেবে গড়ে তুলবে চিন্তা ও চেতনায়, চরিত্রে ও কর্মে। আমরা ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের অনুসারীরাই আবার গড়ে তুলব একটি বাসযোগ্য বিশ্ব; ইসলামি বিশ্ব । খিলাফত বিলুপ্তির পর থেকে এ অবধি পুরো একটি শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। আমরা মুসলমানরা পরিণত হয়েছি বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত ও নির্যাতিত, অপমানিত ও অবহেলিত এক জাতিসত্তাতে। একটা সময় আশা ছিল, এই খিলাফতকে তার দুর্বলতা থেকে মুক্ত করা গেলে বিশ্ব মুসলমানদের অভিভাবক হিসেবে সে আবারও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু আজ সে পরিস্থিতিও নেই। কারণ, পশ্চিমা আগ্রাসনের থাবায় খিলাফতই টিকে থাকতে পারেনি।আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম উম্মাহর চিন্তামানসও কলুষিত ও দূষিত, বিকৃত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর কারণে উম্মাহর সদস্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় কোনো চিন্তাধারাও তৈরি হচ্ছে না।এ রকম অবস্থায় বিশ্বের কোনো কোনো কোণে কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক ইসলামি সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা–তা যতই দুর্বল আর ক্ষীণ হোক না কেন–তাকে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছে নানা মহল থেকে ।সমাজ পরিবর্তনে, নিজেদের দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে মুসলমানদের এই ধরনের প্রচেষ্টা দেখলে পশ্চিমা রাজনীতিবিদ, শিক্ষিত মহল, বুদ্ধিজীবীসহ কোনো মহলই খুশি হয় না; বরং তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়। তারা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এ রকমই একটি চরিত্র আমরা দেখতে পাই আধুনিক পশ্চিমা জগতের জনৈক খ্রিষ্টান চিন্তাবিদের লেখাতে। তিনি এক লেখায় লিখেছেন–ডব যধাব পড়সব রহঃড় ধহ বষবপঃৎড়হরপ ফধৎশ ধমব, রহ যিরপয ঃযব হবা ঢ়ধমধহ যড়ৎফবং, রিঃয ধষষ ঃযব ঢ়ড়বিৎ ড়ভ ঃবপযহড়ষড়মু ধঃ ঃযবরৎপড়সসধহফ, ধৎব ড়হ ঃযব াবৎমব ড়ভ ড়নষরঃবৎধঃরহম ঃযব ষধংঃ ংঃৎড়হমযড়ষফং ড়ভ পরারষরুবফ যঁসধহরঃু, অ ারংরড়হ ড়ভ ফবধঃয ষরবং নবভড়ৎব ঁং. অং বি ষবধাব ঃযব ংযড়ৎবং ড়ভ ঈযৎরংঃরধহ বিংঃবৎহ সধহ নবযরহফ, ড়হষু ধ ফধৎশ ধহফ ঃঁৎনঁষবহঃ ংবধ ড়ভ ফবংঢ়ধরৎ ংঃৎবঃপযবং বহফষবংংষু ধযবধফ... ঁহষবংং বি ভরমযঃ!ভাবানুবাদ : ‘আমরা এখন সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ এমন একটি থযুগে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে এইসব অবিশ্বাসী (খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী নয়,এমন জনগোষ্ঠী; প্রধানত মুসলিম জনগোষ্ঠীকেই বোঝানো হয়েছে–লেখক), বিশ্বসভ্যতার সর্বশেষ দুর্গকে ধসিয়ে দিতে তৎপর। আমরা যদি রুখে না দাঁড়াই, তবে এই খ্রিষ্টসমাজের বাইরে আমাদের সম্মুখে কেবলই একটি মৃত্যু উপত্যকা দাঁড়িয়ে আছে যেন! [১২৫]এমতাবস্থায় ছোটো-বড়োনির্বিশেষে উম্মাহর প্রতিটি সদস্যকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা আর উদ্যোগ-উদ্যম নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বের বুকে আবারও ইসলাম ও মুসলিমদের আসীন করতে হবে বিজয়ীর আসনে। আমাদেরই হতে হবে ওয়ালিদ, আমাদেরই হতে হবে আইয়ুবি। যে অসম্ভব আঁধার আজ ঘনিয়ে এসেছে এই পৃথিবীতে, ইসলামের মশালটা এখনই না জ্বালালে আর জ্বালাবই-বা কখন?

কিতাবুল তাওয়াবিন : ৬৮

জাবালুল জুনুক : ১০১

মুসলিম উম্মাহের অধঃপতন: কারণ ও প্রতিকার

অধঃপতনের নানাবিধ কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি তার ক্ষেত্র প্রস্তুতেরও বহু ব্যবস্থা রয়েছে। তার এমন সব রাস্তা রয়েছে যা গোড়াতেই খুব চাকচিক্যময়। ক্ষীন দৃষ্টির লোকেদের তা দেখে প্রথম চোটেই ধোঁকায় পড়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। যে বা যারা ঐ রাস্তা ধরে চলবে বিচ্যুতির ছোঁয়া তার বা তাদের আংশিক হ'লেও লাগবে।

১.কুরআন বর্জন

কুরান বর্জন মুসলিমসমাজের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। এটি অধঃপতনের সবচেয়ে মারাত্মক কারণ। কেননা কুরান বর্জন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পথ। আফসোস! আমাদের মুসলিমসমাজের অধিকাংশ এমনকি অধিকাংশ মুসলিম আজ অল্প-সল্প ব্যতীত কুরান পড়েনা। যারা একটু-আধটু তারাও ভেবে-চিন্তে পড়ে না এবং তার নির্দেশিত পথ মেনে চলার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে না। কুরআন বর্জনের কতিপয় ধরণ রয়েছে, যেমনটা আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম রহ. বলেছেন।-

১.নিজে কুরআন তেলাওয়াত বর্জন করা এবং কেউ কুরআন তেলাওয়াত করলে মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ না করা।

২.কুরআন পড়লেও এবং তার উপর ঈমান রাখার দাবি করলেও কুরআন অনুযায়ী আমল না করা এবং কুরআনে ঘোষিত হালাল ও হারাম মেনে না চলা।

৩.দ্বীনের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ের মীমাংশায় কুরআনের কাছে বিচার প্রার্থনা পরিহার করা।

৪.কুরাআন অনুধাবন এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করা। কুরআনের মালিক আল্লাহ তা'আলা কুরআন থেকে কি ইচ্ছা পোষণ করেছেন তা জানার চেষ্টা না করা।

৫.আত্মার সকল রোগ-ব্যাধির চিকিৎসায় কুরআনকে মোটেও কাজে না লাগানো এবং আল্লাহ দেওয়া আত্মিক চিকৎসা বাদ দিয়ে অন্যদের চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়া।

এইগুলোর সবই রাসূল সা. কর্তৃক তাঁর প্রভুর সমীপে কৃত অভিযোগের অর্ন্তভূক্ত।

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَٰذَا ٱلْقُرْآنَ مَهْجُوراً

'সেদিন রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার উম্মত এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল' (ফুরক্বান ২৫/৩০)

বড় কষ্ট লাগে, বড় দুঃখ লাগে যখন দেখি, কুরআনকে বাদ দিয়ে মুসলিমরা আজ কুরআন বিরোধী আধূনিক নানা বিষয় নিয়ে মেতে আছে। হ'তে পারে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে তাদের মনে সন্দেহ দানা বাধাঁর ফলে এমন হয়েছে, অথবা কু প্রবৃত্তির তাড়নায় তারা কুরআন বিরোধী বিষয় বেছে নিয়েছে। তারা আজ গান শোনে, গানের আড্ডয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কুরআনের মোকাবেলায় মানব রচিত বই-পুস্তককে প্রধান্য দেয়, মানুষের বক্তৃতা-ভাষণ শুনে, মানুষের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে, মানুষের সুর দেওয়া গান গায়, কিন্তু কুরইন পড়া ও শোনার কথা তারা মোটেও মনে করে না। কুরআনের সঙ্গে যারা এমন আচরণ করবে স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের সঙ্গে তাদের দূরত্ব তৈরি হবে, তাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বাড়বে, বিপদাপদও বড় হয়ে দেখা দিবে।

২. রাসূলুল্লাহ (ছা:)-এর সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া

একইভাবে প্রিয় নবী (ছা:)-এর সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়াও আমাদের মুসলিমসমাজের অধঃপতনের অন্যতম বড় কারণ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً

'সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথে চলে,আমরা তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে যেতে চায় এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা। সুরা নিসা-৪/১১৫

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া একইভাবে প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়াও আমাদের মুসলিমসমাজের অধঃপতনের অন্যতম বড় কারণ। মহান আল্লাহ বলেন,
#'সুপথ স্পষ্টহওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথে চলে, আমরা তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে যেতে চায়এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা হ'ল নিকৃষ্ট
ঠিকানা' (নিসা ৪/১১৫)।
আল্লাহ তা'আলা সতর্ককারী ও ভর্ৎসনাকারী রূপে বলেন, 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফেৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' (নূর ২৪/৬৩)।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তার সুন্নাহ অবজ্ঞাকারীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, ' যারা আমার সুন্নাহ্র প্রতি বিরাগ পোষণ করবে তারা আমার উম্মাহভুক্ত নয়'।" তিনি আরো বলেছেন, 'আমি তোমাদের আলোকোজ্জ্বল দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি; যার রাত তার দিনের মতোই দৃশ্যমান। আমার পরে ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ দ্বীন থেকে বেঁকে বসবে না' ।" আরেক হাদীছে তিনিবলেছেন,
'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ'। ১৬
সুতরাংআল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ এবং আল্লাহর নবীর সুন্নাহ পরিত্যাগ ধ্বংস, পথভ্রষ্টতা ও অধঃপতনের বড় কারণ। আমরা মহান আল্লাহর নিকটে এহেন আচরণ থেকে পানাহ চাই।

১৪. বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫।

১৫. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; আহমাদ হা/১৭১৮২; ছহীহাহ হা/৯৩৭।

১৬. হাকেম হা/৩১৮; ছহীত আত-তারগীব হা/৪০; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২০১২৩ ।

এই মরণঘাতী ব্যাধি ও বিপজ্জনক অবস্থার প্রতিকার হিসাবে আমাদের মুসলিমসমাজকে অবশ্যই কুরআনের কাছে ফিরে আসতে হবে। তারা কুরআনী বিধানকে নিজেদের জীবনে অবশ্য পালনীয় করে নিবে। তারা বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করবে, কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে তারা কুরআনের ভিত্তিতে প্রতিপালিতহবে।
আমাদের সন্তানেরা পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু তারা কম সংখ্যকই কুরআন পড়ে। কাজেই কুরআনের ভিত্তিতে তাদের প্রতিপালিত হওয়ার প্রশ্নই এখন আর ওঠে না। অথচ প্রতিপালন সূত্রে পিতা-মাতার উপর ফরয ছিল তাদের সন্তানদের কুরআন অধ্যয়ন করানো এবং সততার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে কুরআন নিয়ে চিন্তা- গবেষণা করানো। অভিভাবকদের উপর এ দায়িত্বও ফরয ছিল যে, তারা মাদরাসা (শিক্ষালয়) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করানোর মাধ্যমে তাদের কুরআনের জ্ঞান পাকাপোক্ত করাবে। ভাইয়েরা আমার, এ জাতি যদি তাদের মুসলিসমাজকে এবং নিজেদেরকে অবক্ষয় ও অধঃপতন থেকে বাঁচাতে চায়, উদ্ধার করতে চায় তবে এ উম্মাহ্ ছোট বড় সকলকেই বংশপরম্পরায় এ কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।
শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, 'নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক সকল মুসলিমের উপর ফরয এই পদ্ধতি অনুসারে চলা এবং হকপন্থী আলেমদের থেকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুধাবন করা। যেমন মালেক ইবনু আনাস (রহঃ) এবং পরবর্তীতে তার অনুসরণে আরও অনেকে বলেছেন, এই উম্মতের প্রথম যুগের মানুষেরা যে পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়েছে শেষ যুগের মানুষেরাও তা অবলম্বন না করা পর্যন্ত সংশোধিত হ'তে পারবে না' ।
শায়খ বিন বায আরো বলেন, 'উম্মতের প্রথম যুগের লোকেদের আল্লাহ্ কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, কুরআনও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য একে অপরকে উপদেশ দেওয়া, এ কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র পথে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে সংশোধন ঘটেছিল। সুতরাং ভাইয়েরা আমার, আমাদেরও সকলের কর্তব্য হবে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার জন্য একে অপরকে

উপদেশ দেওয়া ও এ কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা এবং আমাদের রবের কিতাব ও আমাদের নবীর সুন্নাহকে সবকিছুর উপরস্থান দেওয়া।

৩. সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ না বুঝা

মুসলিমসমাজের অধঃপতনের আরেকটি কারণ কুরআন ও সুন্নাহ্র বাণীকে উম্মাহ্ সালাফ তথা পূর্বসূরীগণ যে অর্থে বুঝেছেন তা থেকে ভিন্ন অর্থে বুঝা। তাদের অনুধাবিত অর্থ পরিহারকে বৈধ বলে আক্বীদা পোষণ করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র বাণীর নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কার করা।

কুরআন ও সুন্নাহ্র বাণীর নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কার এবং আধুনিক যুগের সাথে সঙ্গতির মানসে নতুন নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে বর্তমান ধার্মিক ও অধার্মিকরা পরস্পরে কিসের আহ্বান জানাচ্ছে? এসব তো পূর্বসূরী সালাফদের বর্ণিত অর্থ থেকে অনেক অনেক দূরে। আল্লাহর কসম! এ জন্যও আমরা আজ পথভ্রষ্ট হচ্ছি। কাদারিয়া চিন্তা-গোষ্ঠী ছাহাবীদের বুঝ বর্জন ব্যতীত অন্য কোন কারণে বিপথগামী হয়নি। খারেজীরাও ছাহাবীদের বলা অর্থ বর্জন হেতু পথহারা হয়েছিল । আমাদের আক্বীদা ও আমলে যে বিচ্যুতি ঘটেছে তা উম্মতের পূর্বসূরীগণ কুরআন-সুন্নাহর বাণীর যে অর্থ বর্ণনা ও অনুধাবন করেছেন তা থেকে সরে আসা ব্যতীত অন্য কোন কারণে ঘটেনি ।

বিশ্বাস করুন, পূর্বসূরীগণের কুরআন-সুন্নাহ্ বুঝ থেকে আমরা দূরে সরে পড়েছি বলেই আমাদের এবং আমাদের মুসলিমসমাজের অধঃপতন ও গ্রুপিং বা দলাদলি ঘটেছে। ফলে আমরা মনের দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছি, আমাদের সমাজ আজ অশান্তিতে ভরে গেছে এবং উম্মাহ্ শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ছে । নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আমার মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকবে অচিরেই তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তোমরা তখন আমার সুন্নাহ এবং সৎপথের পথিক খলীফাদের সুন্নাহ মেনে চলবে। তোমরা মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধরবে। সাবধান! নব আবিষ্কৃত বিষয়ের অনুসরণ থেকে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত বিপদগামী করে' ।[১৮]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে দিয়েছেন যে, তাঁর সুন্নাত তরক করা কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরাম তাঁর সুন্নাহকে যে অর্থে বুঝেছেন সেই অর্থে না বুঝলে উম্মাহর মধ্যে মতানৈক্য ও মতভেদ দেখা দিবে। যে মতভেদ মুসলিম জাতির হৃদয় ভেঙে চুরমার করে দিবে এবং তার দেহ ফালি ফালি করে ফেলবে। একই সঙ্গে তিনি একথাও বলে দিয়েছেন যে, নিন্দিত মতভেদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার পথ হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে যে অর্থে বুঝেছেন সেই অর্থ গ্রহণ করা ।

ইমাম আবূদাউদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) একদিন তার সাথীদের বললেন,

'নিশ্চয়ই তোমাদের পিছনে এমন এক ফেৎনা আসছে যখন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআন উন্মুক্ত হয়ে যাবে। মুমিন, মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, দাস, স্বাধীন সবাই কুরআনের ধারক-বাহক হবে'। অর্থাৎমানুষের মধ্যে অনেকেই এমন বিদ্যার অধিকারী হবে যে, তারা কুরআন নিয়ে কথা বলবে এবং মানুষের সামনে কুরআন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

মু'আয (রাঃ) বলেন, 'তখন কোন বক্তা এমনও বলে বসবে যে, আমিকুরআন পড়ার পরেও কেন লোকেরা আমার অনুসরণ করছে না? তারা আদতে আমার অনুসারী হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তাদের জন্য কুরআন ভিন্ন অন্য কিছু আবিষ্কার করব। খবরদার! সে নতুন যা আবিষ্কার করবে তার কাছে তোমরা ঘেঁষবে না। কেননা সে নতুন যা আবিষ্কার করবে তা হবে পথভ্রষ্টকারী'। [১৯]

সে যে নতুন কথা আবিষ্কার করবে এবং নতুন বুঝ তৈরি করবে তা হবে পূর্ববর্তীদের বুঝের বিপরীত। তাতে কোন মঙ্গল নেই। তা তো ভ্রান্ত একটা পথ। এ পথ অবলম্বন করলে দেখা যাবে কুরআন-সুন্নাহ্র কিছু নছ (স্পষ্ট কথা) আমলে নেওয়া হবে তো অন্য কিছু নছ বাতিল করে দেওয়া হবে। কিছু নছকে অকারণে অন্য কিছু নছের

উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। বিচ্যুতি যখন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দিকে ঘটবে তখন আমরা দেখতে পাব, মুসলিমরাা প্রতিশ্রুতি, আশা ও ক্ষমামূলক নছকে প্রাধান্য দিচ্ছে। তারা মনে করছে আল্লাহ যেহেতু ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি দয়াময় রহমানুর রহীম সেহেতু আমরা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ঘোরে বিভোর থাকলেও এবং পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে থাকলেও আমাদের ক্ষমা পেতে অসুবিধা হবে না ।

সন্দেহের দিকে বিচ্যুতি ঘটলে দেখা যাবে মুসলিমরাা শাস্তিমূলক নছকে প্রাধান্য দিচ্ছে। তারা ভাবে, আমরা যতই ঈমান-আমলের অধিকারী হই আমাদের কি ক্ষমা হবে? এত এত শাস্তি থেকে কি আমাদের ক্ষমা মিলবে? এমন সন্দেহ থেকে তাদের মনে আল্লাহর রহমত ও পুরস্কারের

১৯. আবুদাউদ হা/৪৬১১, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২০৭০৫।

তুলনায় শাস্তির দিক প্রাধান্য পাবে। তারা হতাশ ও ম্রিয়মাণ হয়ে আমল ছেড়ে দেবে। এসবই কুরআন ও সুন্নাহ্র নছের অর্থ অনুধাবনে সালাফে ছালেহীন বা নেককার পূর্বসূরীদের ধারা বা নীতির বিপরীত। বস্তুত বিদ'আতীরা কুরআন ও সুন্নাহ্র নছের যেসব নতুন অর্থ তৈরি করেছে তা পূর্বসূরীদের নীতির বিরোধী ।

এ অবস্থার প্রতিকার হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সালাফে ছালেহীন কুরআন ও সুন্নাহ্র নছের যে অর্থ বুঝেছেন সেই অর্থের ব্যাপক প্রচার করতে হবে। মাদরাসা-মসজিদে খুত্বা ও বক্তৃতায় কোন সংকীর্ণতা ও ক্লান্তি ব্যতিরেকে এবং লোকেরা কী মনে করবে তার পরোয়া না করে পূর্বসূরীদের বক্তব্য অব্যাহত ধারায় বলে যেতে হবে। কেননা এই উম্মতের শেষ যুগে আগত ব্যক্তিই বলি আর জামা'আতই বলি তাদের কারো সংশোধন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা প্রথম যুগের লোকেরা যে পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়েছে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) আল্লাহর বাণী নু টললধষ সড়ঃব পধষভ নববঃর নবুব লর 'তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। এমন ব্যক্তিদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ' (ফাতেহা ১/৫-৬) সম্পর্কে বলেছেন, 'স্পষ্ট পথের অধিকারী আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তরা হ'লেন তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব কথা বলেছেন সেসব কথা জানেন বা সে সম্পর্কে জ্ঞাত। এ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিরা হ'লেন নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথী ছাহাবায়ে কেরাম, তারপর তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী তাবেঈগণ, তারপর তাদের একনিষ্ঠ অনুগামী তাবে-তাবেঈগণ । যা 'কুরুনে ছালাছা' বা শ্রেষ্ঠ তিন যুগ তথা ছাহাবীদের যুগ, তাবেঈদের যুগ এবং তাবে-তাবেঈদের যুগ নামে খ্যাত ।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আল্লাহর কাছে ছিরাতুল মুস্তাকীমের দিশা লাভের জন্য কিভাবে দো'আ করছ? অথচ তুমিই কিনা ছিরাতুল মুস্তাক্বীম জানা-বুঝার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের সুস্পষ্ট পথ থেকে একেবারে আলাদা নতুন এক পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছ! আমাকে

আল্লাহর কসম করে বল, এমন করে কিভাবে তুমি আল্লাহর হেদায়াত আশা করতে পার এবং কিভাবেই বা তুমি দ্বীনের উপর স্থিরতা কামনা

করতে পার?

আমাদের কর্তব্য তো জনগণ যাতে সালাফে ছালেহীন তথা নেককার পূর্বসূরীদের দ্বীনী বুঝের প্রতি ফিরে আসে সেই আহ্বান জানানোর মাঝে আমাদের সব রকমের চেষ্টা নিবদ্ধ করা। আর তখনই অর্জিত হবে দ্বীনের পথে অবিচলতা; তখনই আল্লাহর বান্দাগণ নাজাত পাবে লজ্জা-অনুশোচনার দুষ্টচক্র থেকে ।

আবু দাউদ হা/৪৬০৭, ইবনে মাযাহা হা-৪২, মিশকাত হা ১৬৫।

৫. হকপন্থী আলেমদের অবজ্ঞা করা

আলেমদের অবজ্ঞা করা অধঃপতনের আরেকটি কারণ। এটা এতটাই জঘনা যে, এজন্য আমাদের অশ্রুপাত করা উচিত। এটা খোদ অধঃপতন এবং অধঃপতনের কারণও বটে। অনেক মুসলিমককে দেখা যায় তারা সুন্নাহর অনুসারী আলেমদের অসম্মান করে।

ওলামায়ে রববানী, যারা কিনা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক মযবৃতভাবে আমল করে, মুসলিমরাা তাদের সম্মানহানি করে। যে ওলামায়ে রব্বানীরা শরী'আতের মূল উৎস থেকে শারঈ বিদ্যা অর্জন এবং অন্যদের শিখাতে তাদের জীবন পার করেন, মুসলিমরাা তাদের ঘৃণার চোখে দেখে। যে

আলেমগণ আল্লাহর হুকুম পালনে নিজেদের জীবন কুরবানী করেন, পছন্দনীয় লোকেরা যাদের আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তার পথে স্থির থাকার সাক্ষ্যদাতা, যাদের বিদ্যা ও ফৎওয়ার পতাকা পতপত করে ওড়ে আমাদের মুসলিমকেরা কিনা সেই আলেমদেরই তাদের সমালোচনার পাত্র বানিয়ে নেয়। এভাবেই তারা মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের মিকারে পরিণত হয়। তারা তাদেরকে নিকৃষ্ট পথের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। যার একদিকে থাকে সন্দেহ-সংশয় এবং অন্যদিকে থাকে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার ফন্দি ফিকির।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! যখন কোন মুসলিমককে দেখবেন আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে সে খুবই অলস, ফরযসমূহ তরককারী এবং হারামে যথেচ্ছা লিপ্ত তখন নিশ্চয়ই আপনি দুঃখ পাবেন। সেই মুসলিমকই আবার আলেমদের সমালোচনা করে বলছে, আমরা সেসব আলেম চাই না, যাদের মধ্যে এমন এমন কিছু রয়েছে। আমরা যেসব আলেমকে চাই, যাদের কথায় এটা হারাম, ওটা ফরজ ইত্যাদি বিধি-বিধানের আলোচনা নেই। আমরা কেবল তাদের মুখে ওয়াজ-নছীহত শুনব। তারা আমাদের ওপর কোন দায়-দায়িত্বের কথা বলবেন না, কোন কর্তব্য চাপাবেন না। যারা বড় আলেম বলে নিজেরা নিজেদের যাহির করছেন তাদের আমাদের কোন দরকার নেই, তাদের মাঝে আমাদের কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। তারা আজেবাজে ধরনের লোক। আপনি খুবই বিস্ময় বোধ করবেন এবং মনোকষ্ট পাবেন যখন দেখবেন একজন মুসলিমদেরমাঝে ভাল ভাল চিহ্ন ফুটে উঠছে, তার দেহে সুন্নাহ দৃশ্যমান, তার বাহ্যিক কাজকর্ম সবই ভাল, কিন্তু তাকেই দেখবেন সভা-সমিতিতে আলেমদের অপমানসূচক কথা বলছে, তাদের কুৎসা গাইছে, অপদস্থ করছে এবং নানাভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে। এ কাজ নিজেই একটি বিপজ্জনক বিচ্যুতি এবং অনেক বিপজ্জনক বিচ্যুতির কারণও বটে।

এহেন অধঃপতনের প্রতিকারে আমাদের মুসলিমরা যাতে আল্লাহওয়ালা আলেমদের সম্মান করে যেভাবে তাদের প্রতিপালন করতে হবে। তারা তাদের দেওয়া ফৎওয়া মেনে নিবে, তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবে, তাদের মর্যাদা বজায় রাখবে এবং কেউ তাদের বেইজ্জতি করলে তাতে

বাধা দিবে। খতীব ও বক্তা যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন তাদের বক্তৃতায় এমন সব কথা থেকে দূরে থাকতে হবে যাতের মুসলিমসমাজের আল্লাহভক্ত আলেমদের প্রতি ঘৃণা জন্মে। চাই সেসব কথা তারা ভাল খেয়ালে বলুন কিংবা মন্দ খেয়ালে বলুন।

শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান বলেন, মুসলিম আলেমদের সম্মান করা ফরয। কেননা তারা নবীদের উত্তরাধিকারী। তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা মানে তাদের পদমর্যাদা এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকারকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা; তারা যে বিদ্যা বহন করছেন সেই বিদ্যাকে তুচ্ছ ভাবা। তাদের লব্ধ বিদ্যা, উম্মাত্র মাঝে তাদের অবস্থান এবং মুসলিম জাতি ও ইসলামের কল্যাণে তারা যে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন সেজন্যই তাদের সম্মান জানানো ফরয'। তিনি আরো বলেন, আলেমদের উপর যদি ভরসা করা না যায় তবে কাদের উপর ভরসা করা যাবে? যখন আলেমদের উপর ভরসা নষ্ট হয়ে যাবে তখন মুসলিমরা তাদের সমস্যা সমাধানে কাদের দ্বারস্থ হবে? কাদের নিকট থেকেইবা তারা শারঈ হুকুম-আহকাম জানবে? এমন হ'লে তো তখন এ উম্মাহ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বো।

শায়খ সত্যই বলেছেন। এখন তো আমরা তার কিছু নযীর দেখতে পাচ্ছি। অনেককেই এখন আমরা দেখতে পাই, তারা নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য আলেমদের ফতওয়া উপেক্ষা করেন এবং এমন সব লোকের মতামতের পিছনে দৌড়ান বিদ্যা বলতে যাদের ভাঙাচুরা ছিটেফোঁটার বেশী কিছু নেই। আল্লাহ পাকের নিকট আমরা সকাতর

প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেন এবং আমাদের পরিবার-পরিজনকে পাক-পবিত্র আলেমদের সেই বৃক্ষমূলে ফিরিয়ে নিতে সাহায্য করেন, যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আকাশচুম্বী।

অবসর ও সময়ের সদ্ব্যবহার না করা :

অবসরকে কাজে না লাগানো এবং সময়ের সদ্ব্যবহার না করা মুসলিমসমাজের অধঃপতনের আরেকটি কারণ। মানুষ যখন অবসর পায় তখন যদি তা কল্যাণমূলক কাজে না লাগায় তবে তা তাকে ক্ষতিকর কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তখন সেই অবসরই তার গলার কাঁটা হয়ে দেখা দেয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

'দু'টি নে'মত নিয়ে অনেক মানুষ ধোঁকায় পতিত হয়, স্বাস্থ্য ও অবসর'।[২২] এখানে নবী (ছাঃ) অবসরকে বান্দার জন্য আল্লাহর নে'মত গণ্য করেছেন। যখন বান্দা তার অবসরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে ব্যবহার করবে তখন তা আল্লাহ্ নে'মতে পরিণত হবে। কিন্তু মুসলিমরাা যদি তাকে মূল্যবান ভেবে কাজে না লাগায় তাহ'লে সেই অবসর নে'মত না হয়ে আযাবে পরিণত হবে এবং উপহারের বদলে কষ্টে রূপায়িত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ-এর উপর আল্লাহ রাযী থাকুন । তিনি বলেন,

- 'আমি সেই লোককে অবশ্যই ঘৃণা করি যে তার অবসর সময়কে না দুনিয়ার কাজে লাগায়, না আখেরাতের কাজে লাগায়'।[২৩]

এ ব্যাধির প্রতিকারে মুসলিমকদের সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। তাদের অবসর সময়কে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণে লাগাতে হবে। আমরা নিজেদের এবং আমাদের মুসলিমকদের নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নের বাণী অনুযায়ী আমলে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, যা কিনা তিনি আদেশ ও নছীহত সূত্রে আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

২২. বুখারী হা/৬৪১২; ইবনু মাজাহ হা/৪১৭০; মিশকাত হা/৫১৫৫।

২৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৪৫৬২; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/১৩০ পৃ.।

৪০

তুমি পাঁচটি অবস্থার পূর্বে পাঁচটি অবস্থাকে মূল্যবান গণ্য করবে। তোমার বার্ধক্যের আগে তোমার যৌবনকে, তোমার অসুস্থতার আগে তোমার সুস্থতাকে, তোমার দারিদ্র্যের আগে তোমার ধনাঢ্যতাকে, তোমার ব্যস্ত তার আগে তোমার অবসরকে এবং তোমার মৃত্যুর আগে তোমার জীবনকে'।[২৪]

ভাইয়েরা, এ সমস্যার প্রতিকারে সময় যে একটা সুযোগ এবং অবসর যে একটি নেমত তা আমাদের জানতে হবে। সেই সাথে আমাদের মুসলিমকদেরও তা জানাতে হবে। হারিয়ে যাওয়া সময় আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই এগুলো আমাদের হাতছাড়া হওয়ার আগেই কিংবা আমাদের উপর আযাব হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই আমাদেরকে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথামত এ দু'টিকে কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে হবে।

অসৎ সঙ্গ :

অসৎসঙ্গ গ্রহণ মুসলিমসমাজের অধঃপতনের আরেকটি কারণ। সঙ্গী একজন আকর্ষণকারী বটে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীন-ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং তোমাদের কে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে তা যেন লক্ষ্য করে'।[২৫]

এক বন্ধুর আচরণ-অভ্যাসই অন্য বন্ধুর আচরণ-অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অভ্যাস করাতের মত খাঁজে খাঁজে মিলে যায় এবং যে কোন সাহচর্য বা সঙ্গ প্রভাব বিস্তার করে।

২৪. মুস্তাদরাক হাকেম ৪/৩৪১, হা/৭৮৪৬; ছহীহুল জামে' হা/১০৭৭; মিশকাতহা/৫১৭৪।

২৫. আবুদাউদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯।

৪১আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ)বলেছেন,

'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মেশক বহনকারী ও হাপরে ফুঁদাতা কামারের মত। মেশক বহনকারী হয় তোমাকে কিছু এমনিতে দিবে অথবা তুমি তার থেকে কিছুটা কিনতে পারবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি এমনিতেই সুগন্ধ পাবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুঁদাতা হয় তোমার কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিবে, নয় তুমি তার নিকট থেকে কটু গন্ধ পাবে'।[২৬]

এ ধরনের অধঃপতন চুলকানি-পাঁচড়ার মতো সংক্রামক, এমনকি তার থেকেও এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। শয়তান এরূপ মুসলিমদেরঘাড়ে সওয়ার হয়, যাতে তাকে কেন্দ্র করে তার অন্য সাথী-সঙ্গীদের পথভ্রষ্ট করতে পারে। তাইতো দেখা যায়, কত মুসলিমক আজ অসৎ সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে মাদকাসক্ত হয়ে গেছে! চরিত্রবান কত মুসলিমক খারাপ সঙ্গীর কুহকে জড়িয়ে পাক-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ ডুবে গেছে! এমন কত মানুষ আছে যারা একদিন নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য অনুগ্রহ-অনুকম্পা ছিল, তারাই আজ স্বীয় পরিবার ও সমাজের জন্য সাক্ষাৎ আযাবে পরিণত হয়েছে। এর পিছনে কারণ ঐ খারাপ সঙ্গী। বিকৃত চিন্তাধারী এমন অনেক সাথী যে কতজনের চিন্তায় বিকৃতি ধরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এমন চিন্তার ফলে তারা হয় পুরোপুরি কাফের হয়ে গেছে, নয় দুষ্কৃতিকারী পাপাচারীবনে গেছে।

২৬. বুখারী হা/৫৫৩৪; মুসলিম হা/২৬২৮।

২৭. ধূমপান, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, চুরি-ডাকাতি, পর্দাহীনতা, দ্বীন পালনে অনীহা, দ্বীনের বিরোধিতা, নাস্তিকতার বিস্তার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাথী ও সহপাঠীদের যে ব্যাপক ভূমিকা আছে তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। আবার সৎসঙ্গীদের চেষ্টা ও প্রভাবে অনেকেই এসব খারাপ আচরণ ছেড়ে দিয়ে ভাল পথে ফিরে এসেছে, দ্বীন-ধর্মের খাঁটি অনুসারী হয়ে গেছে তাও চির সত্য। তাই এ সমস্যার প্রতিকার হিসাবে মুসলিমরাা এমন লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করবে যারা নিজেরা ভাল মানুষ, সঠিক পথের অনুসারী এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন। যারা সুন্নাহ অনুসরণের জন্য প্রসিদ্ধ এবং যারা নিজেদের ভাল আচরণ, নিজেদের অবলম্বিত যথার্থ পথ ও নিজেদের লব্ধ বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে মুসলিমশ্রেণী ও অন্যদের ভাল কাজে যুক্ত করেন এবং জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেন।

সুতরাং, লোকদের সঙ্গ গ্রহণের আগে একজন মুসলিমদেরকর্তব্য হবে তাদের হাল-হকিকত ও খ্যাতি পরখ করে নেওয়া। যদি সঙ্গ লাভের জন্য বাছাইকৃতরা চরিত্রের অধিকারী হন, সুস্পষ্ট দ্বীন মেনে চলেন এবং দ্বীন পালনে সমাজে তাদের সুনাম-সুখ্যাতি আছে, তবে তারাই হবে তার কাঙ্ক্ষিত হারানো ধন। তাদের দরজায় গিয়েই তার বাহন থামবে। কিন্তু যদি মূল্যায়িত ও বাছাইকৃতরা উক্ত মানের না হয়, তাহ'লে অবশ্যই তাদের থেকে সাবধান ও দূরে থাকতে হবে। মিষ্টি মিষ্টি কথা এবং বাহ্যিক জাঁকজমক দেখে যেন সে ধোঁকা না খায় । কেননা এসব মিষ্টি কথা ও বাহ্যিক সৌন্দর্য এমন প্রতারণা ও গোমরাহীর কারণ হ'তে পারে যার আড়ালে সময় বিশেষে বড় রকমের বিশৃঙ্খলা লুকিয়েথাকে।

সন্তান যাতে সৎ সঙ্গীদের সঙ্গ গ্রহণে সক্ষম হয় সেজন্য পিতা-মাতার সহযোগিতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করা আবশ্যক। পিতা-মাতা দু'জনেরই নিজ সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গদান বা সময় ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য। যার- তার সঙ্গে সঙ্গদানের জন্য সন্তানদের ছেড়ে দেওয়া পিতা-মাতার জন্য মোটেও উচিত নয়। এমন করলে যখন সন্তান পিতার মাথায় কুড়াল মারবে তখন সে কাঁদবে আর বলবে, আমার ছেলে এখন আমার অবাধ্য হয়ে গেছে! আমার

ছেলে একসময় মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়মিত জামা'আতে আদায় করত; অথচ এখন সে মোটেও ছালাত আদায় করে না!! আমার ছেলে ছিল রহমত বরকত অথচ এখন সে আমার জন্য সাক্ষাৎ আযাবে পরিণত হয়েছে!!!

পিতা-মাতাকে শুরু থেকেই এ বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। সন্তানেরা যাতে সৎ সঙ্গী বেছে নেয় সেজন্য তারা গোড়া থেকেই তাদের উৎসাহিত করবে। একজন মুসলিমদেরঅবশ্যই সাথী-সঙ্গী দরকার। আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, আমাদের মুসলিমকদের আমরা ঘরে আবদ্ধ করে রাখব, তাদের কোন সাথী-বন্ধু থাকবে না। কিন্তু মুসলিমকদের কর্তব্য হবে নিজেদের জন্য এমন সব বন্ধু গ্রহণ করা, যারা তাদের উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে, জান্নাতের পানে চালিত করবে। যাদের মধ্যে খারাপ কাজ ও খারাপ আচরণ দেখতে পাবে, যাদের দেখবে তারা খারাপ পথ ও অবক্ষয়ের দিকে ডাকে তাদের বন্ধুত্ব গ্রহণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে, যদিও তারা হাসিমুখে তাদের পানে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন কারো সঙ্গে একবার বন্ধুত্ব করে ফেললে দহরম-মহরমের আগেই সরে পড়তে হবে, যাতে পদস্খলন না ঘটে।

গণমাধ্যম ও ইন্টারনেট আসক্তি

গণমাধ্যম ও ইন্টারনেট অধঃপতনের আরেক মাধ্যম। গণমাধ্যম ও ইন্টারনেট যে কি সাংঘাতিক, তা আপনি জানেন কি? অনেক গণমাধ্যম তার সকল উপকরণসহ আজ অধঃপতনের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন গণমাধ্যমের কাজই হ'ল কামনা-বাসনার রগরগে বর্ণনা তুলে ধরা, মানুষের মনে যৌন সুড়সুড়ি উস্কে দেওয়া, প্রণয় ভালবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, সমাজ থেকে লজ্জা-শরম উঠিয়ে দেওয়া, যারা লজ্জা-শরম মেনে চলে তাদের নিন্দা করা, মুসলিমরা যাতে অপরাধ ও অবক্ষয়মূলক কাজের অনুশীলনে মেতে ওঠে সেজন্য তাদের উৎসাহিত করা, তারা যাতে পরস্পরে মিলে সমাজ ও চরিত্র বিধ্বংসী অনুষ্ঠান করে তাদের জন্য সে ধরনের অনুষ্ঠানের রূপরেখা তুলে ধরা ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহ আমাদের এ জাতীয় আচরণ থেকে হেফাযত করুন!

কোন কোন গণমাধ্যমের কাজ হল মানুষের মাঝে সন্দেহের বীজ বপন করা, তাদের মন খারাপ করে দেওয়া, তাদের মনে হিংসার চাষ করা এবং এমন সব রীতি-নীতি চালু করা, যা মানুষের অন্তরকে ইসলাম থেকে বিগড়ে দেয়। মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে দেয় এবংতাদেরকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যে পথ বুঝেছিলেন এবং মেনে চলেছিলেন উম্মতের সালাফগণ । এসব গণমাধ্যম সর্বদা কিছু লোকের দিকে, কিছু গ্রন্থের দিকে এবং কিছু নতুন নতুন চিন্তা ও দর্শনের দিকে আহ্বান জানায় । যার দ্বারা প্রভাবিত মুসলিমসমাজ নিজেদের সমাজ এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় আলেম ও শাসক শ্রেণীকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকে। রাজনীতির নামে কিংবা ধর্মের নামে তারা এমনকরে থাকে।

কিছু গণমাধ্যম তো ঈমান-আক্বীদার গোড়া কাটায় ব্যস্ত। যাদু-টোনা, রাশিফল, আপনার ভাগ্য আজ কেমন যাবে, নক্ষত্রের সাহায্যে কিভাবে আপনার ভবিষ্যৎ জানবেন ইত্যাদি খারাপ বিষয় প্রচার করা তাদেরকাজ।

মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত ইন্টারনেট আরেকটি প্রচার মাধ্যম। এই প্রচার মাধ্যমের সার্চ ইঞ্জিন সংখ্যাও অনেক। এসব সার্চ ইঞ্জিন বহুলাংশেই অপরাধ ও অবক্ষয়ের দিকে উঁচু স্বরে আহ্বান জানায়। ইন্টারনেটের কোন কোন মাধ্যম প্রচুর সংখ্যায় অবৈধ প্রণয়- প্রীতি ও কামনা-বাসনার কথা প্রচার করে। এর ফলে বহু মানুষ অধঃপতনের শিকার হ'তে থাকে। কোন কোন মাধ্যম প্রচুর পরিমাণে বাতিল চিন্তা ছড়িয়ে দেয়। সেখানে মিলে অজ্ঞাত পরিচয় লোকদের বহু লেখালেখি, অজ্ঞাতনামা লোকদের অনেক বক্তৃতা-বিবৃতি ও ফওয়া ইত্যাদি।

আফসোস আজ অনেক মুসলিমক ইন্টারনেটের প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত। তারা ইন্টারনেটে প্রচারিত সেসব বিষয় খুবই পসন্দ করে। সেগুলো কে বলেছেন তার নাম জানা নেই, অথবা জানা গেলেও সেই লোকই যে তা বলেছেন, অন্য কেউ বলেননি তা নিশ্চিত নয়, আবার তিনি যে ইসলামের শত্রু না মিত্র তাও জানা যায় না।

ভাইয়েরা আমার! আজ অনেক মুসলিমকই ইন্টারনেটে উপস্থাপিত কথা খুব করে, অথচ তারা বিশ্বস্ত আলেমদের কথা গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, বিশ্বস্ত আলেমগণ রচিত গ্রন্থ মানতে তারা প্রস্তুত নয়। এ এক দুরারোগ্য ব্যাধি। আমাদের

কর্তব্য এ ব্যাধির চিকিৎসা গ্রহণের কথা জোরেশোরে বলা। এ বারি চিকিৎসা হিসাবে বলব, যাদের অন্তরে যথার্থ মর্যাদাবোধ আছে, যারা কল্যাণের পথের পথিক, যারা গণমাধ্যম সম্পর্কে অবহিত, যারা মুসলিম উম্মাহকে সাথে নিয়ে আল্লাহর দেখানো ছিরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলতে আগ্রহী তাদের অবশ্যই গণমাধ্যমের এই ভয়াবহ ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই প্রচার মাধ্যমে এমন কথা তুলে ধরতে হবে যা হবে গঠনমূলক, ধ্বংসাত্মক হবে না; উম্মাহকে হকের উপর ঐক্যবদ্ধ করবে, তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করবে না। মানুষকে সুন্নাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাবে, সুন্নাহ থেকে তাদের মন বিগড়ে দেবে না। দ্বীনী প্রোগ্রামে যারা আলোচনাকারী তাদের এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরকারী।

তাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, আজ তারা কথা বলছে, বই-পুস্তক ইত্যাদি লিখছে, আগামীকাল তাদেরকেই প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সেদিন তারা জিজ্ঞাসিত হবে। সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। কেবল সরল মন নিয়ে যে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে সেই ফায়েদা লাভ করবে। তাদের আরো জেনে রাখতে হবে যে, শরী'আতের আলোকে জনমানুষের উপকার সাধন, যে ধরনের কথায় তাদের কল্যাণ হবে তা তাদের সামনে তুলে ধরা তাদের জন্য অবধারিত ও নির্ধারিত ফরয। জনগণ তাদের পিছনে আসুক কিংবা না আসুক এবং তাদের কথা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হোক কিংবা না হোক, সর্বাবস্থায় তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে। গণমাধ্যমের আলোচকমাত্রই নিম্নের হাদীছের বাস্তবায়ন তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভাল কোনকাজ চালু করবে সে তার এ কাজের ছওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা তার দেখে এ কাজ করবে তাদের ছওয়াবও সে পাবে। তবে এতে তাদের ছওয়াব হ্রাস পাবে না। আর যে ইসলামের মধ্যে মন্দ কোন কাজ চালু করবে ঐ মন্দ কাজের পাপের বোঝা তার উপর বর্তাবে এবং তার পরে যারা তার দেখে ঐ কাজ করবে তাদের সে কাজের পাপের বোঝাও তার উপর বর্তাবে। তবে এতে তাদের পাপ হ্রাস পাবে না'।

সুতরাং যিনি আলোচনা করেন তিনি যেকোন ক্ষেত্রে বিশেষত প্রচার মাধ্যমে আলোচনাকালে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, তিনি যদি লোকজনকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানান তাহ'লে তিনি কল্যাণ লাভ করবেন এবং একের পর এক আগত কল্যাণের সুসংবাদ লাভ করবেন। পক্ষান্তরে কোন আলোচক যদি ভ্রান্ত কোন কথা কিংবা কাজের দিকে আহ্বান জানান, আর যদিও লোকেরা তার সে কথা কিংবা কাজকে খুব চমৎকার ভাবে, যদিও লোকেরা সেই কথা কিংবা কাজের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং যদিও প্রচুর লোক তাতে অংশ নেয় তবুও তার মনে রাখতে হবে যে, এ আলোচনার মাধ্যমে তিনি নিজের কাঁধে এমন বোঝা চাপাচ্ছেন যা বহনের ক্ষমতা তার নেই। এর ফলে বস্তুত তিনি নিজের উপর একের পর এক অথৈ ভ্রান্তি তুলে নিচ্ছেন। আর নানাজনে তার কথিত ভ্রান্তপথ অবলম্বনের কারণে ক্বিয়ামত দিবসে তিনি এমন অবস্থায় হাযির হবেন যে, সেই নানাজনের ভ্রান্তির পর ভ্রান্তির দায় নিজ কাঁধে বরে বেড়াবেন।

কাজেই কোন মুসলিম যখন গণমাধ্যমে কিংবা অন্য কোথাও কথা বলবেন তখন তাকে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করে কথা বলতে হবে। হাশরের ময়দানের সেই ভয়ঙ্কর অবস্থানক্ষেত্রের কথা তার চোখের সামনে জাগরূক রাখতে হবে। কথা বলার সময় তার চোখের উপর আল্লাহর

২৮. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সে দৃশ্য ভাসবে, যখন আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন, কি কি কথা তিনি বলেছিলেন এবং কি কি কাজ করেছিলেন? যদি তিনি তার কথার সমর্থনে আমাদের রবের কিতাব থেকে এবং আমাদের রাসূলের সুন্নাহ থেকে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুসারে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন তবেই যেন তিনি আলোচনা করেন, নচেৎ চুপ থাকাই হবে তার জন্য শ্রেয়। আল্লাহর কসম! একাকী নিঃসঙ্গ জীবন- যাপন, যাকে কেউ জানে না, চিনে না, যার প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করে না তার জন্য ঐ জীবন-যাপন থেকে অনেক শ্রেয় যে জীবনে প্রচুর খ্যাতি অর্জিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্ বিরুদ্ধে গিয়ে অর্জিত হয়েছে।

আপনি বরং আপনার আলোচনায় প্রচার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সমাজে যে দ্বীনী মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রতিরোধ ও প্রতিকারের চেষ্টা করুন। ঈমানের পথে অবিচল থাকার সঠিক উপায়-

উপকরণ অবলম্বনের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করুন । আপনার আগ্রহ থাকবে ঈমানের পথে অবিচল থাকার উপকরণসমূহ যাতে ঘরে ঘরে প্রচুর বিদ্যমান থাকে সে চেষ্টা করা এবং আপনার আগ্রহ থাকবে যেন আল্লাহর দেখানো পথের উপকরণও ঘরে ঘরে মওজুদ থাকে সে উপায় বাতলানো।

ফেৎনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়া

অধঃপতনের আরেকটি কারণ ফেৎনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়া। ফেৎনার জাঁকজমকভাব ও জৌলুস দেখে বহু মুসলিমক তাতে অবাক হয়ে যায়। অনেক সময় বেহুদা কাজে মশগূল তরুণ-মুসলিমরাা তাদের ফেৎনার পথে টেনে নিয়ে যায়। আবার অনেক সময় ফেৎনাবাজদের বিলাসী জীবন যাপন করতে দেখেও তারা ফেৎনার প্রতি প্রলুব্ধ হয় । অথচ ফেৎনা থেকে

৩২. মুসলিম হা/১৭; মিশকাত হা/৫০৫৪।

দূরে থাকা এবং তার ধারে-কাছেও না যাওয়াই ছিল ফরয। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

‘অচিরেই বহু ফেৎনা দেখা দেবে। সেই ফেৎনাকালে বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি দ্রুত বেগে ধাবিত ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে । যে ব্যক্তি ফেৎনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফেৎনা তাকে গ্রাস করে ছাড়বে। আর যে ফেৎনা থেকে বাঁচার জন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবে সে যেন সেই আশ্রয় গ্রহণ করে’। ৩৩

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

‘এক সময় এমন ফেনা দেখা দেবে যখন ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। আর জাগ্রত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। আবার দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম অবস্থানে থাকবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ফেৎনা থেকে বাঁচার জন্য কোন স্থান কিংবা আশ্রয় পাবে সে যেন সেই আশ্রয় গ্রহণ করে'।

৩৩. বুখারী হা/৩৬০১; মুসলিম হা/২৮৮৭।

৩৪. মুসলিম হা/৭১৪১; মিশকাত হা/৫৩৮৪।

অর্থাৎ হে আল্লাহর বান্দাগণ, মানুষ যতই ফেৎনার নিকটবর্তী হবে ততই তারা খারাপের সাথে জড়িয়ে পড়বে। এজন্যই মুসলিমসমাজের অধঃপতন এবং ফেৎনায় জড়িয়ে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ ফেনা ওফেৎনাবাজদের পাশে তাদের অবস্থান।

আবূদাউদ (রহঃ) ইমরান বিন হোসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

‘যে দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শুনবে সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। কেননা আল্লাহর কসম! যেকোন লোক যখন তার কাছে যাবে, তখন সেই তাকে মুমিন মনে করবে এবং তার মধ্যে তখন নানা সন্দেহ জাগবে বিধায় সে দাজ্জালের পিছু নেবে'। ৩৫

সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি কারো সম্পর্কে শুনতে পাবে যে, সে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ্র বিপরীতে আইন-কানূন খাড়া করছে এবং মানুষকে আলেম-ওলামা ও (কুরআন-সুন্নাহ্র বিধি অনুযায়ী) শাসন ক্ষমতায় আসীন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে, তখন সে যেন অবশ্যই তার থেকে দূরে থাকে। যদিও তার মনে হয় যে, লোকটার কথার পিছনে দলীল-প্রমাণ আছে এবং সে হক পথের উপর আছে। তথাপি এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য কি তা সে জানে না। ফলে সে না বুঝে কখনো কখনো তার কাছে এসে তার কথা শোনার ফলে ফেনায় পতিত হয়। অথচ সে মনে করে যে, সে ভালই করছে এবং তার মনে প্রকৃত ইসলাম নিয়ে সন্দেহ জাগতে থাকে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা, ফেৎনা থেকে কঠিনভাবে দূরেথাকবে।

পাপ, উদ্বিগ্নতা ও কুচিন্তা :

খোদ পাপ কাজ অধঃপতনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আবার পাপ কাজের পিছনে পেরেশানি ও কুচিন্তার মতো যেসব কারণ কাজ করে সেগুলোও অধঃপতনের কারণ। পাপ, পেরেশানি ও কুচিন্তা সর্বতোভাবে মানুষকে বিপদগামী করে। তার কারণ একটা পাপ আরেকটা পাপ টেনে আনে। পাপ একে অপরের সঙ্গে গলা ধরে জড়িয়ে থাকে। তাই দেখা যায়, একটা পাপ করলে তা সামনের আরেকটা পাপের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহকে বক্র করে দিলেন' (ছফ ৬১/০৫)।

পাপের এ দরজা ব্যাপক প্রশস্ত। এজন্যই জনৈক পূর্বসূরি বলেছেন, 'ভালোর প্রতিদান ভালো এবং মন্দের প্রতিফল মন্দ'। ভাইয়েরা আমার! পাপ ও গর্হিত কাজের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তির জীবন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও সংকুচিত হয়ে পড়ে । তা থেকে কখনই তার মুক্তি মেলে না। কখনও তার চেহারায় হাসি ফুটে উঠলেও তার অন্তর থাকে মহা দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'আর যে ব্যক্তি আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন- জীবিকা সংকুচিত হবে এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে? অথচ আমি তো দুনিয়াতে ছিলাম চক্ষুষ্মান। আল্লাহ বলবেন, এটাই বিধান। তোমার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আর সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হ'ল' (ত্ব-হা ২০/১২৪-১২৬)।

তাদের কারো কারো জীবনে তো সঙ্কট খুবই গভীর হয়ে দাঁড়ায় এ তার জন্য বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নেয়। আল্লাহ আশ্রয় দিন এমন জঘন্য কাজ থেকে। আত্মহত্যা তো অনেক বড় কবীরা গুনাহ। অনেকের মন আবার দুশ্চিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে সে তার প্রতিকারার্থে অন্য একটা পাপ করে বসে। তাতে তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি আরো বেড়ে যায়। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক জাতির সাধারণ মানুষ ও জ্ঞানীজন এ কথায় একমত যে, পাপ-পঙ্কিলতা ও ফেৎনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়ার ফলে মানুষের মনে দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, ভয়-ভীতি, দুঃখ- বেদনা, মানসিক সংকীর্ণতা, হার্টের রোগ ইত্যাদির জন্ম হয়। এমনকি ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা যখন কোন একটা ফেৎনা-ফাসাদে পতিত হয় এবং তাদের মন তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তারা নিজেদের মনের মধ্যে বিদ্যমান সংকীর্ণতা, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করতে নতুন কোন ফেৎনা-ফাসাদ আমদানিতে সচেষ্ট হয়। যেমন ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের জনৈক ব্যক্তি এক পংক্তিতে বলেছেন,

'এক পিয়ালা পান করি আমি মজা পেতে,
আর এক পিয়ালা পান করি তার প্রতিকারে'।

এ রোগের ওষুধ হ'ল : পাপী ব্যক্তি দ্রুতই আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে এবং খালেছ মনে তওবা করবে। তওবা ছাড়া আর কোন উপায়ে তা থেকে আরাম ও প্রশান্তি মিলবে না। যে অধঃপতনের নানা কারণ থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক তার কর্তব্য হবে আল্লাহর কাছে সত্য ও খাঁটি মনে তওবা করা।

উপসংহার

মুসলিম উম্মাহের অধঃপতনের কারণ অনেক। আমাদের বর্ণিত কারণছাড়াও এক্ষেত্রে আরও অনেক কারণ আছে।

৩৬. মুসলিমসমাজের অধঃপতনের যেসব কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করেছেন সেগুলো যদি জেনে-বুঝে আমরা এবং আমাদের মুসলিমসমাজ অধঃপতনের কারণ থেকে মুক্ত হ'তে সচেষ্ট হই তবে আমাদের সমাজ ইনশাআল্লাহ সুন্দর ও নিরাপদ হবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থিত ছিরাতুল মুস্তাকীমে চলতে পারব ইনশাআল্লাহ। তাঁর বর্ণিত কারণ ছাড়াও যেমনটা তিনি বলেছেন আরো অনেক কারণ রয়েছে। আমরা তেমন কিছু কারণ এখানে তুলে ধরছি। সেসব কারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ অন্যতম। বিশ্ব জুড়ে আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয়জয়কার। এ সভ্যতার কিছু ভাল দিক থাকলেও আমরা তার ভালটুকু গ্রহণের পরিবর্তে মন্দ দিকই বেশী গ্রহণ করছি। নারী- পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, অবাধ যৌনাচার, সমকামিতা, লিভ টুগেদার, বিবাহ বিচ্ছেদ, মাদকাসক্তি, ধূমপান, মাতা-পিতা ও বয়স্কদের দায়িত্ব বহন না করা, পারিবারিক ভাঙনের মাঝে এক অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শিশুর বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ ।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশও আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছোবলে আক্রান্ত । ক্ষমতা ও অর্থলিপ্সাও মুসলিমসমাজের অধঃপতনের পিছনে দায়ী। ক্ষমতার অলিন্দে যাদের বসবাস তারা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ কতটা ভোগ করছে এবং দেশে-বিদেশে কিভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ছে তা দেখে মুসলিমসমাজের মনে ক্ষমতা ও অর্থলিপ্সা জাগা অসম্ভব নয়। সুনীতির মাধ্যমে সবসময় এসব কিছু উপার্জন সম্ভব নয় বলে দুর্নীতিকে এখন সকলেই প্রশ্রয় দিতে চায়। ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সবাই দহরম-মহরম গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যাতে পরবর্তীতে কোন জটিলতায় পড়তে না হয় ।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও মুসলিমকদের অধঃপতনে কম-বেশী ভূমিকা রাখছে। পার্থিব জীবনের সুযোগ-সুবিধা অর্জনই এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য। পরকালের চিত্র আলোচনা এখানে একেবারেই গৌণ। আখেরাতে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার আলোচনা আমাদের উচ্চশিক্ষায় বলতে গেলে একেবারেই নেই। কেউ হয়তো বলবেন, আমাদের শিক্ষা আমাদেরকে খারাপ কিছু করতে বলে না। কথা সত্য বটে, কিন্তু খারাপ পরিবেশে আত্মরক্ষার কোন উপায়ও তা নির্দেশ করে না। ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে এই শিক্ষিত শ্রেণীই যে অফিস-আদালত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, গণমাধ্যম ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ছে তা তো অসত্য নয় ।

আমাদের পরিবার ও সমাজও মুসলিমসমাজের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। পরিবার থেকে অবক্ষয় রোধের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণের কোন ব্যবস্থা নেই । কারো

আমাদের সকলেরই কর্তব্য হবে অধঃপতনের বিপদ উপলব্ধি করা। আমরা যেন বিচ্যুতির কারণসমূহের প্রতিকারে খুব সচেষ্ট থাকি। আমাদের মধ্যে যারা অধঃপতন ও বিচ্যুতির শিকার হয়েছে তাদের সোজা পথে ফিরিয়ে আনতে যেন আমরা তৎপর হই। কারো সোজা পথে ফিরে আসা নিয়ে আমরা যেন হতাশ না হই। কেননা মানুষের অন্তর তো করুণাময় আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে। তিনি যেভাবে চান পরিবর্তন করেন। ভাইয়েরা, আমাদের কর্তব্য উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা। আমাদের রবের নিকটেই তো রয়েছে চূড়ান্ত কৌশল। তার হাতেই তোরয়েছে সকল কাজ।

আমরা আল্লাহর পথের দাঈ হই আর খতীব হই, যা-ই হই না কেন, আমাদের নিজেদের বেলাতেও অধঃপতনের কারণাদি থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। আমরা যেন নিজেদের নিয়ে ধোঁকায় না পড়ি । আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। অবশ্যই নিজেদের কথাবার্তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের দাওয়াতী বিষয় ও কাজ পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের রবের কিতাব এবং আমাদের নবী (ছাঃ)- এর সুন্নাতের পাল্লায় নিজেদের কার্যাবলী মাপতে হবে। তবে তা না আমাদের বুঝ অনুযায়ী হবে, না আমাদের মতো লোকেদের বুঝ অনুযায়ী হবে। বরং তা হ'তে হবে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর বুঝ অনুযায়ী। তাদের বুঝ অনুযায়ী যারা এক আলোকোজ্জ্বল ধারায় ছাহাবায়ে কেরামের

বুঝের বার্তা আজ আমাদের নিকট তুলে ধরেছেন, তারা হ'লেন সেইসকল আলেম যারা সুন্নাহ্‌র জ্ঞানে সুপরিচিত, জ্ঞান-গরিমা ও সুপ্রসিদ্ধ।

আমাদের দায়িত্ব হবে নিজেদের বিচার করা এবং আমাদের মাঝে অধঃপতন ও বিচ্যুতির যেসব কারণ রয়েছে তার চিকিৎসা ও প্রতিকারে এগিয়ে আসা। আমাদের মুসলিমসমাজ যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং অধঃপতনজাত কোন কাজের মজায় যেন তারা বিভোর হয়ে না থাকে। কেননা অধঃপতনের শুরুতে মজা মিললেও তার শেষ পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং, আসুন, আমরা আল্লাহকে ভয় করি। তার সুন্দর ও মহতী নাম ধরে তার নিকট এই আবেদন-নিবেদন করি, তিনি যেন পথহারা মুসলিমদের পথের দিশা দান করেন।

হে আল্লাহ! তুমি পথহারা মুসলিমদের পথের দিশা দাও, আমাদেরকে সঠিক পথের অগ্রপথিক করো এবং সঠিক পথপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করো।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ দান করো এবং আমাদের মাধ্যমে অন্যদের সঠিক পথ দান করো। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু, তুমি এই উম্মতের জন্য সঠিক কাজ, সঠিক পথ ও তাক্বওয়া লাভ সহজ করে দাও; হে সকল সৃষ্টির প্রতিপালক।

হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কাছে এই মিনতি করছি যে, তুমি সকল মুসলিমের অন্তরকে হেদায়াত ও দ্বীন ইসলামের উপর একাট্টা করে দাও; হে সকল সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ! উম্মাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের যত কারণ আছে তা তুমি দূর করে দাও। হে আল্লাহ! উম্মাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের যত কারণ আছে তা তুমি দূর করে দাও। হে সকল সৃষ্টির প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সুন্নাহ্‌র অনুসারী হিসাবে বাঁচিয়ে রাখো, সুন্নাহ্ অনুসারী হিসাবে মরণ দিও এবং সুন্নাহ্‌র উপরে হাশরে উঠায়ো! হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমাদের তুমি সামর্থ্য দাও তোমার নবী করীম (ছাঃ)-কে ভালবাসার; তোমার নবী(ছাঃ)-এর সুন্নাতকে ভালবাসার। আর আমাদেরকে তুমি তাঁর সুন্নাতের উপর অটল ও স্থির রেখো সেদিন পর্যন্ত, যেদিন আমরা তোমার সাক্ষাতে মিলিত হব। হে রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আড়াল করে রাখ ধরণীর বুকে, আড়াল করে রেখো ধরণীর তলে এবং আড়াল করে রেখো আমলনামা উত্থাপনের দিনে। আমলনামা উত্থাপনের দিনে আমাদের পাপের কারণে তুমি আমাদেরকে তোমার সামনে অপদস্থ করো না। আ-মীন ইয়া রাব্বাল আলামীন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন তার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর।